প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৬১

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
রবীন দত্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

আমার শৈশব

শিক্ষারম্ভ

ভোরের আলো ফোটার আগে আঁধারে আলোয় মেশা একটা সময়, দূর থেকে প্রভাতী কীর্তনের মিষ্টি সুর আর খঞ্জনির রুনুঝুনু ধ্বনি এগিয়ে আসছে। গানের কথাগুলো যখন শোনার মতো কাছে এসেছে, তখন মনে হয় যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের সবাইকে দিনের আগমনি গান শুনিয়ে জাগিয়ে দিতেই তার এগিয়ে আসা।

প্রভাত সময় কালে
শচীর আঙিনাতলে
গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে।

আমাদের ঘুমভাঙানিয়া টহলদারের কথা ও সুরের রেশ ধীরে ধীরে যেমন এগিয়ে আসে, তেমনই মিলিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে তখন গুনগুন সুরে শুনতে পাই :

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিতপাবন সীতারাম,
নির্ভয় করো মোরে রাজারাম।

চরকার সুতো কাটার ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাবা গেয়ে চলেন শ্যামল সুন্দর রামের অশেষ গুণগান। ও দিকে ওপর থেকে দাদুর গলায় দেবী দুর্গার বন্দনাগান আর তার সঙ্গে একতারার টুংটাং ভেসে আসে। একটু পরেই উঁচু গলায় ডাক ছাড়েন দাদু, "সবাই উঠে পড়ো, পড়তে বোসো।" গরমকালে টুক করে উঠে পড়ি। শীতে লেপের ওম ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। বার বার তিনবার যখন ডাক পড়ে, তখন যে যার ঘরে ঘুম-ঘুম চোখে উঠে পড়তে বসি। পুবের আকাশ লাল করে ভোর হয়ে আসে। পাখিদের নানান সুরের কলতান শোনা যায়।

চারদিকের মানুষজন সব উঠে দিনের কাজের আয়োজন করছে। বড়মা উঠে চৌকাঠে জল দিয়ে উঠোনে মারুলি লেপে দুর্গাবাংলায় জল দিতে যাচ্ছে। তোলা উনুনে মস্ত এক কেটলি গরম জল বসেছে। চা হয়ে গেলে ছোট-বড় নানা মাপের কাপ বা গেলাসে ঢেলে চা-পানের আহ্বান জানায় মা বা কাকিমা। ছোটরা বেশির ভাগ কল-বেরোনো ছোলা গুড় সহযোগে খেয়ে জল খাই। চায়ের জন্য যদি কেউ জোর আবদার ধরে সে একটু পায়। এই পর্ব শেষ হলে দুর্গামন্দিরের পাশের ঘরে নিজের নিজের বইখাতা নিয়ে বাড়ির পাড়ার কচিকাঁচা একদল ছেলেমেয়ে পড়তে বসি। ভবতারণ মাস্টারমশাই আসেন পড়াতে। দেখতে একটা ছোটখাটো পাঠশালার মতোই হয়। যত না পড়া হয় বকুনি খাই বেশি। বড় সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগের কঠিন কঠিন শব্দের বেড়াজালে খেই হারিয়ে ফেলি। পারব না এই ভেবেই কুঁকড়ে থাকি। বইখাতা ছিঁড়ে ফেললে বা অসাবধানে ময়লা করলে, মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠে বিদ্রুপ ঝরে পড়ে, "এ বার মাকে বলিস, এগুলো ভাতের হাঁড়িতে দিয়ে সেদ্ধ করে দেবে। গিলে ফেললে সব বিদ্যের জাহাজ হয়ে যাবি।" বাঁকা কথার খোঁচায় বিদ্ধ হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তরগুলো আমতা আমতা করে ভুলভাল বলি, এ বার হয়তো মাথায় একটা ঠোক্কর খাই আর মাথাটা যতটা নিচু করা যায় করে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই আর ভাবি কতক্ষণে ছাড়া পাব। কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমশাইয়ের সময় হয়ে যায়, উনি উঠে পড়েন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হইহই করে ভেতরে এসে কোনওমতে চান সেরে ভাত খেয়ে উরুপতি মাস্টারের পাঠশালায় যাই। সেখানেও একই রকম সব, কেবল পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে বেত থাকে। মাঝে মাঝে সেটা নাচিয়ে হুংকার ছাড়েন, ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি কখন বুঝি সেটা আমার পিঠেই পড়ে। পাশে কারও পিঠে পড়লে সে কাঁদতে শুরু করলেই তার ব্যথা নিজের মনে হয়। চোখ ফেটে জল আসে, পড়ায় মন কিছুতেই বসে না। কথামালার গদ্য আর পদ্যপাঠের পদ্য সব যেন মনের ওপর দিয়ে চলে যায়। সেই বইগুলোই যদি

বাড়িতে নিজের মনে পড়ি তখন ভালো লাগে, মনেও থাকে। পাঠশালায় সময় কেটে যায় হই-হট্টগোলের মধ্যে। যাদের সঙ্গে পড়ি কেউ পিছন থেকে চুল ধরে টানে। কেউ পাশে বসে চিমটি কাটে। উঃ আঃ করার কোনও উপায় নেই; সামনে গুরুমশাই মূর্তিমান ভয় হয়ে বসে আছেন। সব শেষে তাঁর প্রিয়পাত্র এবং বড় ছেলে চিৎকার করে বলতে থাকে এক-এ চন্দ্র দুই-এ পক্ষ তিন-এ নেত্র চার-এ বেদ। আমরা সবাই তার চেয়েও গলা চড়িয়ে তার উচ্চারিত শব্দগুলি বলতে থাকি। পরে নামতাও ওইভাবে শিখি। অঙ্ক শেখার সময় বেতের দু'তিন ঘা সবাই খায়, আমিও হয়তো খেয়েছিলাম। তার সঙ্গে ঠোক্করও থাকত। সেই কারণেই চিরদিনের মতো অঙ্ক কষায়, হিসেবপত্র রাখার অনীহা ও ভীতি রয়েই গেল। কোনওদিনই পাটিগণিতে প্রীতি এল না। পরে অ্যালজেব্রা জ্যামিতির জোরেই প্রবেশিকা পার হয়েছিলাম।

খেলাধুলা

ছুটির পর বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে একটু খেয়ে নিয়ে খেলতে যাই। খেলার কোনও বিশেষ জায়গা আমাদের নেই। মাঠঘাট পুকুরপাড় বাবুর বাগান বা কারও বাড়ির উঠোন সবই আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র, আর খেলাও কত রকমারি। লটাই লুকোচুরি, চোখ টেপাটিপি, ঝিঙে ফুল ঝপঝপিয়ে, আমধল্লা, ছুটোছুটি করে ছুঁয়ে ফেলে কাউকে মোর করা, যে লুকোবে তাকে খুঁজে বার করা, একজনের চোখে হাত দিয়ে ঢেকে বলবে হয়তো 'আয়রে আমার মাধবী' বা অন্য কিছু। অমনি একজন এসে কপালে টিপ দিয়ে চলে যাবে। যার চোখ বন্ধ যদি সে যে টিপ পরিয়েছে তার নাম বলতে পারে তবে সেই মেয়েটি তার জায়গায় এসে বসবে, তার চোখ বন্ধ করে অন্য নাম ধরে ডাকা হবে। অমনি করে চলবে। ঝিঙে ফুল ঝপঝপিয়ে বলতে বলতে একজনকে ছুঁয়ে ফেললেই তার আবার পালা আসবে ঝিঙে ফুল ঝপঝপিয়ে বলতে বলতে আর একজনকে ছুঁয়ে ফেলার। যে দিন আবার বউদির বাড়ির উঠোনে ঝিঙে ফুল ঝপঝপিয়ে খেলতাম, ওদের বাড়ির ঝিঙে গাছে হলুদ ফুল ফুটে আলো হয়ে থাকত। সেই শোভা দেখতে দেখতে খুশির আনন্দ অনেক বেড়ে যেত। আমধল্লা খেলাটায় একজন আমগাছের ডালে উঠে বসে থাকবে। অন্যেরা চেষ্টা করবে তাকে ছোঁয়ার, যে ছুঁতে পারবে সে আমগাছে উঠবে আর অন্যজন তাকে ছুঁতে চেষ্টা করবে এইভাবে চেষ্টা চলবে। কোনওদিন আবার এ সব না খেলে, পথের ধুলোবালির মধ্যে পা ঢুকিয়ে চাপড়ে চাপড়ে আস্তে পা বের করে নিয়ে ঘর বানানো আর চারপাশে ধুলোবালি দিয়েই পাঁচিল করে কলকে ফুল পেড়ে এনে কত পরিপাটি করে তাকে সাজানো।

লাল ধুলোর ওপর হলুদ ফুলগুলি দেখতে কী ভালোই যে লাগে! কারটা কত ভালো সেটাই তখন দেখার। তার পর সূর্যদেব পাটে বসলে সাঁঝের মৃদু আলোয় কত সাধের নিজেদের বানানো ঘরবাড়ি নিজেদেরই পা দিয়ে ধুপধাপ করে ভেঙে ফেলা আর একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠা হাতের সুখে গড়লাম পায়ের সুখে ভাঙলাম। ভাঙার মজায় বুঁদ হয়ে বাড়ি ফেরা। মায়েরা তখন তুলসীতলায় দুর্গামন্দিরে সাঁঝের পিদিম জ্বেলে সন্ধে দিচ্ছে। হাত-পা ধুয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে দেখি কাশীপুর গ্রামের ঘর-ফিরতি মানুষজন শূন্য ধানখেতে অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে নমাজ পড়ছেন। কী যে ভালো লাগে মায়েদের সন্ধে দেওয়ার সঙ্গে তাঁদের নমাজ পড়ার মিল খুঁজে পেয়ে।

এ বার পড়তে বসার পালা। মা লণ্ঠন দিয়ে যায়। সেই আলোকে ঘিরে আমরা পড়তে বসি। অন্য ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। মনে মনে পড়তে আমরা জানি না। জোরগলায় চেঁচিয়ে পড়তে ভালোবাসি। খুব বেশিক্ষণ পড়তে পারি না, একটু পরেই ঢুলতে থাকি। কখন খাওয়ার ডাক পড়বে মন থাকে সেই দিকে। ডাক পড়লেই হুটোপাটি করে রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়ে পেতে বসে পড়ি। গরম গরম [illegible] একটু ভালো তরকারি দুধ গুড়ে পরিতৃপ্তি ভরে আহার করি। বিছানায় এসে বাদল-বর্ষা দুই বোন নিবিড়ভাবে এ ওকে আঁকড়ে শুয়ে পড়ি। এই সময় মাকে কাছে পেতে বড্ড ইচ্ছে করে কিন্তু মা যে কখন আসে টেরই পাই না। তখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ি। এমনি করে এক দিনের বৃত্ত শেষ হয়।

আমাদের বাড়িতে সবাই আমরা মেয়ে, একজন কেবল ছেলে— সে আমার দাদা ফটিক। আমরা সবাই কালো, দাদা ফরসা, বোন মেরিও ফরসা। দাদা আমাদের চাইতে বাড়ির অনেক আদরের। বড়দি সীতা, বড় নাতনি বলে ওরও খুব আদর ছিল। ছুটির দিনে সকালবেলা জলখাবারের সঙ্গে রসগোল্লা বরাদ্দ ছিল। দাদা আর বড়দির জন্য আসত বড় রসগোল্লা আর আমাদের জন্য ছোট রসগোল্লা। ওদের যতই ভালোবাসি না কেন আমরা কেন বড় পাব না এই নিয়ে সবারই মনে ক্ষোভ ছিল। দাদা আমাদের ভালোবাসে কিন্তু কারণে-অকারণে চড়টা চাপড়টা মারতে ছাড়ে না। মেজদি সাবিত্রীকে ও সবচেয়ে ভালোবাসত। আমাদের বাড়ির পুব দিকে যে সব বাড়ি আছে তার সবচেয়ে শেষের বাড়িতে একদিন আমরা লুকোচুরি খেলছি, হঠাৎ কী হল জানি না একরাশ ভীমরুল আমাদের ছেয়ে ফেলল। তাদের হুলের জ্বালায় আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম কিন্তু সরু গলি দিয়ে একে একে বার হতে গিয়ে সব শেষে যে রইল তাকে ভীমরুলগুলো তত বেশি হুল ফোটাল। আমরা যন্ত্রণাকাতব

হয়ে দুর্গাবাংলার উঠোনে এসে পৌঁছলাম। তখন দেখি সবার শেষে মেজদি আর হাঁটতেই পারছে না। মুখচোখ ফুলে গেছে। ওর প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। বাড়ির সবাই ছুটে এল। ডাক্তার ডেকে আনা হল। কতক্ষণ ধরে কতভাবে উনি মেজদিকে দেখলেন। ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া হল। বাড়ির সবাই জেগে থেকে ওর সেবা করল। আমাদের সবাইকেও হুল যেখানে ফুটিয়েছে সেখানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। আমার জ্বালাযন্ত্রণা তো আছেই কিন্তু মেজদির অবস্থা দেখে সবাই আমরা মনে মনে কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু দাদা বেচারি মুখ চুন করে বসে আছে। জানা গেল মরাইয়ের গায়ে ভীমরুলের চাকটা ওর নজরে পড়েছিল। একটা ঢিল কুড়িয়ে চাকে ছুড়ে দিয়ে নিজে পোঁ পোঁ দৌড় লাগিয়ে বের হয়ে এসেছে। সবাইকে কষ্ট দিয়ে মজা করতে চেয়েছিল কিন্তু এতখানি হবে ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে ওর সবচেয়ে প্রিয় সাবির যে এমন মর্মান্তিক অবস্থা ওরই দোষে হয়েছে তা বুঝে কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ওর লাল হয়ে উঠেছে। পরে বাড়ির বড়রা সবাই ওকে কত বকল, কিন্তু তাতে ওর যত না শাস্তি হল মেজদির নিদারুণ যন্ত্রণা দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি আর অনেক বড় শাস্তি ও নিজেই পেয়েছিল।

গরমের ছুটির সময় দাদু ভোরবেলা আমাদের নিয়ে খোলা গোরুর গাড়িতে করে কাছারির পাশ দিয়ে জয়দেব যাওয়ার রাস্তায় কাশীপুর গ্রামের কাছাকাছি একটা মস্ত বড় নিমগাছের তলা অবধি বেড়াতে যেতেন। দাদু বলতেন সকালবেলার নিমের হাওয়া শরীরের পক্ষে খুব ভালো। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আমরা বাড়ি ফিরে আসতাম। সকালবেলার এই বেড়ানো আমাদের খুব আনন্দের ছিল। ফেরার সময় পথের ধারে একটা বড় বৈঁচি গাছ পাকা ফলে ভরে আছে দেখে আমরা লুব্ধনয়নে চেয়ে চেয়ে বাড়ি ফিরলাম। দিন যায় এমনি করে। একদিন সবাই মিলে ঠিক করলাম মাস্টারমশাই পড়িয়ে চলে গেলে একদিন দল বেঁধে বৈঁচিফল পাড়তে আসব। যে কথা সেই কাজ। পরের দিনই মাঠের আল ধরে আমরা বের হলাম। বেশ খানিকটা গিয়ে দূরের থেকে সেই গাছ দেখতে পেয়ে চলার গতি অনেক বেড়ে গেল। বড় রাস্তায় উঠে আমরা যখন প্রায় পৌঁছে গেছি, কে আগে গাছে উঠবে ভাবছি হঠাৎ রমণীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলাম, "হেই মাগো, এই সর্বনেশে বিটিছেলেগুলো এখানে তোরা কী করতে এসেছিস। শিগ্‌গির পালা। মরবি নাকি সাপের কামড় খেয়ে। ওখানে কেলে (কালকেউটে) আর খরিস (গোখরো) সাপের আস্তানা, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? দেখতে পাচ্ছিস না, কত বড় বড় গর্ত ওখানে। চারদিক সাপের খোলসে ভরে আছে গাছের তলাটা। পালিয়ে আয়, শিগ্‌গির পালিয়ে আয়

বলছি।" সে দিন ছিল হাটবার। হাটুরে মেয়েরা সেই পথে তাদের বেসাতি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বকে সাবধান করল। যেই না ওদের কথা শোনা, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে দুদ্দাড় করে যে পথে আসা সেই পথেই ছুটতে ছুটতে ফিরে যাওয়া, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুকে তখন মাদল বাজছে। বাড়ির কাছে এসে পাকুড় গাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে নিজেদের শান্ত করে বাড়ি ফিরলাম।

আমাদের বাড়িতে অনেক পায়রা ছিল। তারা যেন আমাদের মতোই এ-বাড়ির অধিবাসী। বারান্দার কার্নিশে তারা বাস করে। দুর্গাবাড়ির ছাতের নীচে কড়ি-বরগার মাঝে মাঝেও তারা থাকে। তাদের বকম বকম ডাক, পাখা ঝাপটানো, অনেক পায়রা মিলে এক ঝাঁকে উড়ে যাওয়া, উঠোনে চাল-ডাল বা গম দেখলে একসঙ্গে নেমে এসে টুকটুক করে খুঁটে খাওয়া; বাসার ভেতর ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়া, তাই থেকে বাচ্চা বেরোনো। এই সব দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে। একটাই আমাদের দুঃখ ছিল কোনওটাই সাদা পায়রা নয়। সবই ছাই রঙের গোলা পায়রা। যেগুলোকে গেরেবাজ পায়রা বলে, যাদের মাথায় একটু ছোট্ট ঝুঁটি আর ধপধপে সাদা রং, মাঝে মাঝে পিছন দিকের পেখমগুলো পাখার মতো ছড়িয়ে দিয়ে গরবিনির মতো হাঁটে সেই রকম পায়রা বাড়িতে আনার প্রবল ইচ্ছে হল। সবাইকে জিজ্ঞেস করি, "ও রকম পায়রা কোথায় পাওয়া যায়?" বাড়িতে কাজ করত ভাদুদিদি, সে আমাদের বলল, "রামসায়রের পুব পাড়ে ভেনো হাড়ির ঘরে ওইরকম পায়রা আছে।" বাড়ির পিছনে পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে কলুপুকুরের পাড় ধরে বাবুর বাগানের ভেতর দিয়ে রামসায়রের পুবপাড়ে যাওয়ার রাস্তা তখন খুবই নির্জন ছিল। ভেনো হাড়ি কে তাই জানি না। যাকে দেখি তার কাছেই ভেনো হাড়ির ঘরের সন্ধান চাই। জিজ্ঞেস করতে করতে শেষ অবধি গিয়ে পৌঁছোলাম। দরজা খোলাই ছিল। কয়েকটা সাদা পায়রা পেখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাড়িটা কেমন যেন! ঘরে একটা তক্তপোশের উপর সাদা চাদর পাতা, তার ওপরে একটা হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা, তাকিয়া, বালিশ সব ছড়ানো রয়েছে। একপাশে একটা টিবিতে ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার বাসন, এক দিকে কত গুলো কাচের গেলাস আর বোতল সাজানো। আমরা এতগুলো মেয়ে ঘরে ঢুকতে যে মহিলা হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল, তার সাজপোশাক যেমন, অঙ্গভঙ্গিও তেমনি। মাথায় পাতা কেটে চুল বাঁধা, কপালে কাচপোকার টিপ, গায়ে নকল সোনার গয়না আর গাঢ় রঙের জমকালো আধারেশমের শাড়ি। ভেনো হাড়িকে খুঁজছি শুনে বলল, "আমি ভেনো হাড়ি, কী চাই?" দুটো সাদা পায়রা চাই

শুনে রেগেমেগে বলে উঠল, "তোরা আর জায়গা পাসনি? ভাগ ভাগ। আর কোনওদিন যদি এমুখো হোস তোদের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!" দূর দূর করে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিল। অদ্ভুত অজানা এক রহস্যময় ঠিকানায় এসে পড়েছিলাম। বাবুর বাগানের ভেতর দিয়ে যখন ফিরছি, সন্ধের অন্ধকারে নির্জন বাগানের গাছতলা দিয়ে আসতে আমাদের গা ছমছম করছে। কোনওদিন আমাদের কেউ ভয় দেখিয়েছিল, 'বাবুর বাগানে ভূত আছে', মনে হচ্ছে সেই ভূতগুলো যেন ফিসফিস করে নিজেদের ভাষায় কী সব বলছে। নানা রকমের পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে নানা ডাক ডাকছে। সে এক ভয়জাগানো পরিবেশ। সবাই মিলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "ভূত আমার পুত শাকচুন্নি ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কী?" চিৎকার করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে হাততালি দিতে দিতে যত জোরে পারি ছুটতে ছুটতে বাগান পার হয়ে বেশ খানিকটা বাড়ির কাছে পৌঁছে তবে শান্তি।

বালিকা বিদ্যালয়

এখন আমরা একটু বড় হয়েছি। তাই আমাদের থানার কাছে ইন্দু পণ্ডিতমশাইয়ের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা হল। আমাদের বাড়ি কাছারিপটিতে। সেখান থেকে ওই বিদ্যালয় বেশ খানিকটা দূরে। একজন মহিলা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান সেখানে। তাঁকে আমরা দিদি বলে ডাকি। পাড়ার যত মেয়ে পড়তে যাই, সবাইকে দিদি বাড়ি থেকে ডেকে নেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে কিছুটা লাইন ধরে গিয়ে ডাঙিলে কালীতলার পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে একটু বেঁকে ত্রিশূলাপট্টিতে থানার কাছে স্কুলে পৌঁছাই। প্রথম শ্রেণি দ্বিতীয় শ্রেণি দুটি ক্লাস নিয়ে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইন্দু পণ্ডিতমশাই ছিলেন প্রধান শিক্ষক। তাঁর টকটকে গায়ের রং, কাটা কাটা নাক-চোখ-মুখ, হাতে কবচকুণ্ডল আর সে যুগের হিন্দু ব্রাহ্মণদের রীতি অনুযায়ী মাথায় একগুচ্ছ টিকি। আমরা সব মেয়েরাই তাঁর স্নেহের পাত্রী ছিলাম আর সকলের দিকেই তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। অনেক ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর আর নানা উৎপাত সামলাতে তাঁকে হিমশিম খেতে হত। দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন ধ্বজাধারী পণ্ডিতমশাই। তাঁর শ্যামলা রং আর ভারী চেহারা। ইনিও আমাদের স্নেহ করতেন। এঁদের দুজনকে কখনওই ভয় করেনি, আপনজন বলেই মনে হত। দুজনে দুটো ঘরে ক্লাস নিতেন, ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে সবাই মিলে একসঙ্গে সরস্বতীর বন্দনা করতাম। পণ্ডিতমশাই শিখিয়েছিলেন—

কজ্জলপূরিত লোচন ভারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে
বীণা-রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।

এই ইস্কুলে এসে সারা বোলপুরের অনেক মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হল। সুদূর শৈশবের সাথীরা আজ কে কোথায় জানি না, হয়তো তাদেরও কখনও আমাদের সেই পুরোনো বিদ্যালয়ের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অল্প কিছু দিন মিশন কম্পাউন্ডের মিশনারি স্কুলে পড়েছিলাম। সেখানকার দিদিমণিদের খুব আপন মনে হয়নি। প্রার্থনায় প্রভু যিশুর গান হত। নিয়মশৃঙ্খলার দিকে খুব জোর দেওয়া হত। কেন জানি না মনে হত, ওঁরা আমাদের একটু নিচুস্তরের জীব বলেই মনে করেন।

আমাদের বাড়ি

বোলপুর তখন একটা গ্রামের মতোই ছিল। রায়পুর সপুরের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম নয়। রেললাইন ও বড় রাস্তার ধারে একটু একটু করে গড়ে ওঠা জনবসতি। স্টেশন থেকে বার হয়ে মূল রাস্তার থেকে বেঁকে দক্ষিণে যাওয়ার যে পথ হাটতলার ভেতর দিয়ে কাছারি পার হয়ে ইলামবাজার জয়দেবের দিকে চলে গেছে, কাছারির আগেই সে পথের পুব দিকে চাটুজ্যেপাড়া আর পশ্চিম দিকে রায়পাড়া। শুনেছি আমার ঠাকুরদা অধরচন্দ্র রায়ের বাবা রামজীবন রায় হুগলি জেলা থেকে রেললাইনে পাথর পাতার কাজ নিয়ে এখানে আসেন।

রায়পাড়ার পশ্চিম প্রান্তে শেষ বাড়িটা ছিল আমাদের। পিছনে একটা ছোট রাস্তা, তার পর আমাদের শৌচাগার। তার পাশে মস্ত এক বাঁশঝোপে সারা দিন দেখি বাঁশের পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। আর একটা আতাগাছ, একটা খেজুরগাছ। তার পরেই মস্ত বড় এক পুকুর, নাম তার কলুপুকুর। কখনও তাতে কচুরিপানা ভাসে। তার লম্বা ফুলগুলো বেগুনি রঙের বাহার নিয়ে জলের উপর ভাসত। যখন পানা পরিস্কার করা হল তখন দুপুরবেলা তার জলে যেন লক্ষ মানিক জ্বলা। পিছনে বিস্তীর্ণ ধানখেত। এক এক সময় তার এক এক রূপ। কখনও হরিৎ, কখনও পীত আর কখনও-বা শস্যশূন্য রুক্ষ মাটি। কোণের দিকে কিছুটা লম্বা আখের খেত। যখন সরষে খেতে ফুল ধরত, হলুদ সে রং দেখে খুব ভালো লাগত। ছোলামটর যখন খুব পুষ্ট হয়ে যেত মাঝে মাঝে সময় পেলেই আমরা সেখানে হানা দিয়ে ছোলা আর কড়াইশুঁটি তুলে তার সদ্ব্যবহার করতাম।

আমাদের পাড়ায় ছোট ছোট ডোবা আর বাঁশঝাড়ের আশেপাশে বাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

ব্রতকথা

সে যুগের সেই গ্রামীণ রক্ষণশীল ও কৃষিভিত্তিক সমাজের বড়দের একদিন মনে হল আমরা বড় হয়ে যাচ্ছি। সবাই মেয়ে বলে মেয়েদের রীতিনীতি আমাদের শিখতে হবে। অঘ্রান মাসে সাঁজপুজুনি (সেঁজুতি) ব্রত করতে হবে। কার্তিক সংক্রান্তি আর অঘ্রানের সংক্রান্তি— তার মাঝে যে রবিবারগুলো পড়বে সেই ক'দিন সন্ধ্যায় ওই ব্রত করতে হবে। চার বছর করলে তখন ব্রত সাঙ্গ হবে। সাঁঝবেলায় উঠোন ভরে আলপনা দিয়ে পুজো হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা, একটা করে আসন। শরের ফুল, অপরাজিতার ডাঁটা, কুলের ছোট্ট ডাল আর প্রচুর ফুল পুজোতে লাগে। আমাদের পাড়ায় বিশেষ ফুল নেই, তাই আমাদের খুব মজা হল। ফুল আহরণের নামে সকালবেলা বেরিয়ে পড়তে লাগলাম। কাছারির পিছনে রেললাইনের নীচে ছোট্ট সাঁকোর ভেতর দিয়ে শুঁড়িপাড়া গঙ্গাসাগরের পাড় সর্বত্র অনুসন্ধান চলে, কোথায় কোন বাড়িতে বা বাগানে গাছ আলো করে ফুলগুলি ফুটে আছে। চুপিসাড়ে হাত সাফাই করে নিজেদের ডালায় তাদের ভরে নেওয়া। কোথাও সহজে কাজ হয়, কোথাও-বা ধরা পড়ি, তবে আমাদের তাতে কিছু যায়-আসে না। ও সবে কান দিলে কি চলে? এখন লজ্জা হয়, সোজা কথায় একে তো চুরিই বলে। মুশকিলে পড়ি যদি কোনও বাড়িতে কুকুর থাকে। ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে। আমাদের সঙ্গে দৌড়ে অবশ্য কোনওদিনই পেরে ওঠেনি, কামড় কখনও খেতে হয়নি। শর বনগুলো হয় মাঠের ধারে। শরের ফুল, অপরাজিতার ডাঁটা, কুলের ডাল এই সব নিয়ে একবেলা প্রায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরি। কেউ বলে না, কেন এত দেরি হল? সন্ধেবেলাতে পুজো। উঠোন জুড়ে আলপনা দেয় মা। একটা করে আসন নিয়ে আমরা বসি। সহজ বাংলায় সেঁজুতি ব্রতের দেবীর কাছে কত কী যে চাই তার যেন শেষ নেই। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গোরু, সিন্দুক ভরা মোহর, আলনা ভরা শাড়ি আর গা ভরা গয়না। জানা অজানা কত যে গয়নার নাম করে আমরা বলি, "তোমাকে দিলাম পিটুলির হার আমায় দিয়ো সোনা মুক্তো হিরের হার।" এখানেই শেষ নয়। শর ধরে বলি, "শর শর শর আমার ভাই গাঁয়ের বর, আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে সতীনের ভাই কুড়িয়ে খায়।" এই বলে শরটি ভেঙে ফেলি। কুলগাছের ছোট্ট ডালটি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলতে থাকি, "কুলগাছ কুলগাছ ঝাঁকুড়ি আমার সতীনের মাকুড়ি। সাত

সতীনের সাতটা কৌটো আমার আছে নবীন কৌটো। নবীন কৌটো নড়ে চড়ে সাত সতীনের মুখটি পোড়ে।" এই বলে কুলের ছোট্ট ডালটি প্রদীপের শিষে ধরে একটু পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের ছোট্ট মনে এই চাওয়াগুলো খুব একটা রেখাপাত করে না, কারণ আমাদের চাওয়ার সঙ্গে এই চাওয়ার কোনও মিল খুঁজে পাই না। ব্রত সাঙ্গ হলে উঠে দাঁড়িয়ে যতটা পারা যায় পা উঁচু করে দু হাতে প্রদীপ যতটা পারা যায় ওপরে তুলে ধরে বলি:

প্রদীপ জ্বলন্ত
বাপের ঘর শ্বশুর ঘর একই চলন্ত
রুপোর প্রদীপ সোনার শিষ
যত দূর যাবে বাদলরানী
আলো দেখিয়ে দিস। (নিজের নিজের নাম ধরে)

যেতে যে এখান থেকে হবেই। এ ঘর আমার ঘর নয়। অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে আমার ঠাঁই হবে। শিশুমনে এই কথাটাই গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা। আমাদের ছোট্ট মনে কি এ সব কথা একটুও রেখাপাত করে? মন তখন প্রসাদের দিকে। নতুন সুগন্ধি আতপ চাল, ভিজে কলা, নারকোল-কোরা নতুন গুড় দিয়ে মাখা নৈবেদ্য আমাদের মুখে এক অনবদ্য স্বাদ এনে দেয়। সেঁজুতি ব্রত করে কী লাভ হয়েছিল জানি না। রাত্রিশেষের ভোরের হেমন্তের শিশিরে ভেজা ঘাসে ঘাসে পা দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফুল খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ আজ জীবনের শেষবেলাতে এসেও মনে হয় বাড়তি পাওনা হয়েই রয়ে গেল।

অন্য একটা ব্রত করতাম। তার নাম 'গোকুল ব্রত'। সারা বৈশাখ মাস বিকেল হলে আমরা দূর্বা ঘাসের খোঁজে বের হতাম। কোথায় কোন জলের ধারে নরম সবুজ দূর্বাদলে মাটি ছেয়ে আছে সেই দিকেই দৃষ্টি থাকত। আমাদের প্রত্যেকের তিন আঁটি করে ঘাস চাই। দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের বীরভূমের শুকনো মাটিতে তা পাওয়া সহজ নয়, তবু যে করেই হোক খুঁজে খুঁজে তা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে রাখি। পরদিন সকাল হলেই প্রত্যেকে একটা থালায় ছোট ছোট বাটিতে হলুদ বাটা আমলা বাটা নারকেল তেল সিঁদুর চিরুনি আয়না আর একটা পাখা নিয়ে গোয়াল ঘরে যাই, একটা ঘটিতে জল থাকে। অপেক্ষাকৃত শান্ত একটি গাভীকে প্রথমে তার পায়ে জল ঢেলে কপালে তেল হলুদ আমলাবাটা দিয়ে চুল আঁচড়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে তাকে আয়না দেখাই। পরে পাখার হাওয়া দিই। শেষে তাকে প্রণাম জানিয়ে তিন আঁটি ঘাস একটি একটি করে খাওয়াই। এবার বলি:

গোকুল গোকুলে বাস।
তোমার মুখে দিয়ে ঘাস,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।

স্বর্গ কোথায় আছে জানা নেই, কিন্তু গাভীর প্রসন্ন দৃষ্টি আর আনন্দে ঘাস খাওয়ার পরিতৃপ্তি দেখতে দেখতে আমাদের মন ভরে যায়।

আমরা করিনি কিন্তু পাড়ার অন্য মেয়েরা গৌরী নন্দরানিরা আরও ব্রত করত, যেমন পুণ্যিপুকুর। উঠোনে মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হত, তাতে জল ঢেলে হত পুকুর আর হলুদ দিয়ে সিঁড়ি বানাত, মন্ত্র বলে ফুল দিত:

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে
দুপুরবেলা!

শেষে বলত:

সীতার মতো সতী হব
রামের মতো পতি পাব।
লক্ষ্মণের মতো দেওর পাব
লবকুশের মতো ছেলে পাব।
আমি সতী নিরবধি
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।

শেষ করত এই বলে:

মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গার জলে।

নন্দরানি গৌরীরা হরির চরণ ব্রত করত। ছোট পেতলের থালায় চন্দন দিয়ে হরির চরণ এঁকে ফুল দিয়ে পুজো করত আর বলত:

হরির চরণ হরির পা
আজ কেন আমার ঠাণ্ডা পা,
কোন সতী পূজেছে পা
সেই সতী ভাগ্যবতী
সাত ভাইয়ের বোন সাবিত্রী সতী।

আমরা এগুলি করতাম না। কিন্তু ওরা যখন করত আমরা সদলে উপস্থিত হয়ে ওদের ব্রত করার আনন্দ ভাগ করে নিতাম।

তখন একটা নিয়ম ছিল। যেখানে মেয়েদের ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির পরে আর পড়ার ব্যবস্থা নেই, সেখানে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণিতে ছেলেদের ইস্কুলে তাদের সঙ্গে মেয়েরা পড়তে পারত।

আমার বাবা অন্য রকমের মানুষ ছিলেন বলে সেই নিয়মের ভিত্তিতে আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। তিনি আমাকে বোলপুর ছেলেদের হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন। একমাত্র আমি মেয়ে হয়েও ছেলেদের সঙ্গে পড়তে গেলাম। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে মাত্র সাত বছর বয়সেই আমার লেখাপড়া সাঙ্গ হবে এ কথা তিনি মানতে পারলেন না। বাবা নিজে ওই ইস্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের ইস্কুলটা একটা অন্য জগৎ। এখানে কতগুলো ক্লাসঘর, কত শিক্ষক, মাঝে টেনিসকোর্ট, পিছনে হস্টেল। সেখানে নিকট দূরের গ্রামের ছেলেরা লেখাপড়া করার জন্য আবাসিক থাকে। একটা লাইব্রেরি আছে। সেখানে কত বই। পিছনে একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সব মিলিয়ে আমার ফেলে আসা মেয়ে ইস্কুলের সঙ্গে আকাশ-পাতাল ফারাক। বাবার সঙ্গে মাঠের আল ধরে এখানে পড়তে আসি। ছেলেদের সঙ্গে একমাত্র মেয়ে হয়ে পড়তে এলেও তারা আমাকে মেয়ে বলে কোনও প্রভেদ করেনি। তাদের চাইতে বয়সটা আবার অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তবু সহপাঠীরা সকলেই যে-কোনও নতুন ছেলে এলে যেমন আগ্রহ দেখায় তেমনই আমাকেও তাদের একজন বলেই মেনে নিয়েছিল।

বাবার সঙ্গে আগে এই ইস্কুলে এসেছি তাই নতুন পরিবেশে এসে আমার অজানা অচেনা লাগে না। বাংলা ইংরেজি সবই নতুন করে জানতে লাগলাম। প্রথম পিরিয়ডে এক বিষয় নিয়ে একজন পড়ান, পরের পিরিয়ডে আর একজন অন্য বিষয় পড়ান। বাবা পড়াতে এলে একটু অস্বস্তি হয়। ধীরে ধীরে সব কাটিয়ে উঠি। টিফিনের সময় ছেলেদের সঙ্গে ঘুরি, ইস্কুলের পশ্চিম দিকে একটা শালবন। চৈত্রের মঞ্জরিত শালবন আশ্চর্য এক সুগন্ধে ভরে ওঠে। আরও কত জানা-অজানা অচেনা সব বনফুল তাদের ফোটার সময়ে বর্ণে-গন্ধে আমোদিত করে আমাদের। জামের সময় প্রচুর জাম খাওয়া হয়, যদিও সে জামে মিষ্টি কম, ঈষৎ কষা, তবুও আমাদের মুখে তাই ভালো লাগে। কুলও আমরা কুলের সময় খাই। টক বেশি, মিষ্টি কম তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ছুটির ঘণ্টা পড়লে ছেলেরা বাড়ি চলে গেলে বাবার সঙ্গেই থাকি। বাবা লাইব্রেরি থেকে একটা বই দেন, আমি পড়ি। বাবা নিজের কাজ করেন। হাইস্কুলে দুই বছর পড়েছিলাম তার মধ্যে কোনওদিন কোনও শাস্তি পাইনি বকুনিও খাইনি।

এখন মনে হয় একমাত্র মেয়ে বলেই হয়তো ওই তফাতটুকু আমার জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা উচিত হয়নি।

লাইব্রেরি

ইস্কুল লাইব্রেরির কাজ শেষ হলে বাবা বোলপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে যেতেন। সে দিনের বোলপুরের সাধারণ পাঠাগারের বাড়িটি দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। লাল টালিতে ছাওয়া একটা মস্ত বড় হলঘর, কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সামনে পিছনে দুটো বড় বড় দরজা। চারদিকে বড় বড় আলমারি, সেগুলি ভর্তি বই। মাঝখানে মস্ত বড় টেবিল। তার চারদিকে চেয়ার। টেবিলের উপরে বৃহৎ আকারের একটি সেঁজবাতি জ্বলত। সন্ধের পরে কেউ কেউ আসতেন বসে পড়তে বা নাম লিখে বই নিয়ে যেতে। আমি যখন পড়তে শিখলাম বাবা প্রথমেই কিনে দিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সেই আমার বড় বই পড়ার হাতেখড়ি। তারপর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত পড়লাম। এই সাধারণ পাঠাগারেই পেলাম চণ্ডীমঙ্গল আর মনসামঙ্গল। আর মনসামঙ্গলে প্রাচীন বাংলার নিজস্ব জগৎ। কালকেতু আর ফুল্লরার নিত্য অভাব-অনটনের ও দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি। দেবী চণ্ডীর বরে এই সৎ দম্পতির একদিন প্রতিদিনের সমস্যার অবসান হল। লহনা-খুল্লনা শ্রীমন্ত-কমলেকামিনী বাঙালির সাগর পার হয়ে জলযানে বাণিজ্য যাত্রার কথা জানতে পারলাম। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর আর মনসার দ্বন্দ্ব, লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসানযাত্রা, স্বর্গে গিয়ে নাচ দেখিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামী-সহ সাত ভাইকে জীবনদান। পরে চাঁদ সদাগরকে মনসার পুজো করতে সম্মত করার কথা যেন পুরাণ নয়, রূপকথাই মনে হয়। মনে প্রশ্ন জাগে, সে দিনের বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়েও নাচ জানত? বার বার পড়েও পুরোনো লাগত না। মনে হত প্রাচীনকালের বাংলা দেশের এ সব অতি আপন কথা।

সাধারণ পাঠাগারের পিছনের প্রাঙ্গণে বোলপুরে প্রথম সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিলেন বাবা। আমাদের পাড়ায় একজন হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার বাইরে থেকে এসেছিলেন। তাঁর মেয়ে রমা ভাগবতের একটি অধ্যায় থেকে আবৃত্তি করেছিল। আমাকে বাবা শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতা। ৭-৮ বছরের একটা মেয়েকে কেন ওই বিরাট কবিতা শেখালেন এই প্রশ্ন যখন মনে জাগে তখন মনে হয়, মানুষের জীবনের যত বড় কীর্তিই থাক তা যে নশ্বর সেই কথাই হয়তো গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন মনে। তখন মেয়েরা আমরা কেউ গান জানতাম না। পুরুষকণ্ঠের

গান হয়েছিল। কে গেয়েছিল মনে নেই। সভাপতি হয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাদের সকলকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। বোলপুরের মানুষও যোগ দিয়েছিলেন সেই সভায় নতুন কিছু দেখার জন্য। আয়োজক হিসাবে বাবা সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। আর উপস্থিত জনগণকেও সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন থেকে বোলপুর যদিও অনেক কাছে, তবু শান্তিনিকেতনের মানুষের সঙ্গে বোলপুরের মানুষজনের অনেক দূরত্ব ছিল। বোলপুরে যে-কোনও বাড়িতে বাইরের কেউ অতিথি হয়ে এলে শান্তিনিকেতন প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল। মেলার সময় বাড়ির মেয়েরা ও ছোটরা গোরুর গাড়ি করে মেলা দেখতে যেতাম। ঘর-সংসারের ছোটখাটো সামগ্রী মায়েরা কিনতেন আর কাঠের পুতুল, মুখোশ, কাচের ছোট পুতুল, বাঁশি, ছড়ি-বেহালার মতো ছড় টেনে বাজানো যায় এমন ছোট্ট বাজনা ছোটরা পেতাম। পাঁপড় ভাজা, মিষ্টি খাওয়া হলে আমাদের কাছে মেলার মজা আরও জমে উঠত।

আমার কথা অন্য, আশৈশব বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি, বাবার সাইকেলে একটা ছোট্ট সিট ছিল সামনের রডে আমার জন্য। প্রথমে তিনি যেতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে। তাঁরা কত কী আলোচনা করতেন বোঝার ক্ষমতা ছিল না। শুধু নীরবে শুনতাম। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি যখন প্রথম দেখলাম বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলাম। উঁচু শেল্‌ফের মধ্যে কত শত বই ভরা রয়েছে। সেখানে প্রভাতদা ছিলেন বইয়ের ভাণ্ডারী আর সত্যদা ছিলেন তাঁর সহকারী। বাবা ওখানে মেম্বার ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে বই আনতে ও ফেরত দিতে যেতেন। আমাকে একটা বই দিয়ে বসিয়ে রেখে ওপরে যেতেন ক্ষিতিমোহন সেন মশাইয়ের সঙ্গে মধ্যযুগের সন্ত দাদূ রুইদাস নানক কবীর ও তুলসীদাসের কথা আলোচনা করতে। আমি ছোট্ট থেকে বই দেখতে দেখতে পড়তে পড়তে তাকে ভালোবেসেই ফেললাম। বই পড়াই সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হয়ে উঠল। বই পড়ার আগ্রহ দেখে বাবা আমাকে মাসিক 'মুকুল' পত্রিকার গ্রাহক করে দিলেন। সে দিনের বোলপুরের কোনও মেয়ের এমন অসীম সৌভাগ্য হয়নি। ডাকে যখন পত্রিকা এল, আমাকে আর পায় কে? একবার ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়ে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে ফুর্তির শেষ রইল না।

কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বোলপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের, সমাজসেবার কাজে। তাঁকে তাই বোলপুরেই দেখেছি বন্যাত্রাণের শোভাযাত্রার

পুরোভাগে অথবা কোনও রাজনৈতিক সভায়। বন্যাত্রাণের কথায় মনে পড়ল, একবার অজয়ের বন্যায় বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। তখন আমার বয়স ৬-৭ হবে। আমাদের দুর্গাবাংলায় অনেকে এসেছিলেন বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য। তাদের দুর্দশার কথা শুনে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছিল, আমার নিজের সোনার বালা দুটি খুলে তাঁদের ঝুলিতে দিয়েছিলাম।

আমার বাবা-মা প্রথম দম্পতি যাঁরা গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন। গান্ধীজির মতাদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী এমন মানুষ যাঁরা বোলপুরে আসতেন বাবার পরিচিতি জেনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্রথম এসেছিলেন সনৎকাকা (সনৎকুমার ভট্টাচার্য) আর অনাথকাকা (অনাথনাথ বসু), তাঁরা তখনকার সিয়ানের ডাঙার কাছে একটা আশ্রম করেছিলেন। পরে তাঁরা চলে যান। সনৎকাকা মাঝে মাঝে আসতেন। একবার সনৎকাকা একজন (নাম মনে নেই) শাস্ত্রীমশাইকে সঙ্গে নিয়ে নববর্ষের আগে বোলপুরে এসেছিলেন। নববর্ষে শান্তিনিকেতনে উৎসব হয়। বাবা সনৎকাকা ও শাস্ত্রীমশাই সেই উৎসবে যোগ দেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। এত দিন শান্তিনিকেতন যাওয়া-আসা করছি, সেই নববর্ষের উৎসবে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথকে এত কাছ থেকে প্রথম দেখলাম। জ্যোতির্ময় বিশ্বকবিকে দেখে অভিভূত হলাম। আমার শিশুমন রবির বিভায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি যে সব কথা বলেছিলেন তা বোঝার মতো বয়স আমার হয়নি। সুন্দর করে সাজানো সভায় অপূর্ব আলপনায় ভরা আঙিনা, এক পাশে গানের দল এস্রাজ নিয়ে বসে আছেন। মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে তাঁর অনুপম কান্তি নিয়ে বিরাজমান। ছেলেমেয়েদের নাচ গান আবৃত্তি আর কবির নিজের কবিতা ও কথা— দেখেশুনে কোথা দিয়ে দু'ঘণ্টা কেটে গেল বোঝাই গেল না। সভার শেষে সবাইকে ফল মিষ্টি ও শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। সনৎকাকা বাবা ও শাস্ত্রীমশাই কবিগুরুর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে পথ চলছিলেন। বাঁধের পারে ওঠার আগে, গুরুপল্লির পূর্ব-দক্ষিণপ্রান্তে এসে এক ভদ্রলোককে দেখে সনৎকাকা বললেন, "এই মেয়েটিকে আপনি নেবেন?" তিনি খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "এসো খুকু, তুমি আমার কাছে খুব ভালো থাকবে।" তিনি এগিয়ে এসে হাত ধরতেই ভয়ে দুঃখে আমি কেঁদে সারা। সনৎকাকা আমাকে ফেলে এগিয়ে যেতেই উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না দেখে তিনি বললেন, "কাঁদছ কেন? এখানে কত বন্ধু পাবে, তোমাকে আমরা সবাই ভালোবাসব।" যাঁকে চিনি না, জানি না, তাঁর কাছে থাকতে আমার তীব্র আপত্তি প্রকাশ করতে লাগলাম। শেষ অবধি আমাকে সনৎকাকারাই নিয়ে ফিরলেন, আমি সারা পথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদতে কাঁদতে চললাম। পরে আমাকে তাঁর এই দুষ্টুমিভরা চালাকির জন্য অন্য নানা কথা বলে ভুলিয়ে দিতে চাইছিলেন। বাড়ি এসে মাকে বললেন, ''বউদি আপনার কাঁদুনি বোকা মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিন যে কখনওই ওকে আমরা কারও কাছে রেখে আসতাম না।'' আমাকে বোকা বানানোর জন্য আমি ওঁর সঙ্গে সারাদিন কথা বলিনি। যে দিন চলে গেলেন আমাকে আদর করতে এলে আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম। ফিরে গিয়ে উনি আমাকে একটা খুব সুন্দর চিঠি দিয়েছিলেন রাগ ভাঙাবার জন্য। আমার তখন ওঁর জন্য বড্ড মন কেমন করছে। রাগ কোথায় জল হয়ে গেছে।

মোল্লান আর বিরাজমা

আমাদের পাড়ায় এক বুড়িমা ছিলেন, তাঁকে সবাই মোল্লান বলত। তাঁর কেউ ছিল না, তিনি আমার বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাদের দুই বোনের নাম তিনি দিয়েছিলেন বাদল আর বর্ষা। অসময়ে বৃষ্টির দিনে জন্মেছিলাম বলে আমি বাদল আর বোন বর্ষাকালে জন্মেছিল বলে বর্ষা। মেয়েদের অদ্ভুত নাম মায়ের পছন্দ হত না। বলতেন, ''আমার মেয়েদের নাম শুনে সবাই হাসে।'' বাবা উত্তর দিতেন, ''যেই হাসুক তোমার মেয়েদের ওই নামই থাকবে। ওর কেউ নেই, ও যদি তোমার মেয়েদের নাম রেখে খুশি হয়, ওইটুকু খুশি ওকে হতে দাও।''

আর একটি বোন যখন এল মায়ের কোলে, সুন্দর ফরসা মেয়ে দেখে মা ওকে ডাকতে লাগলেন 'ফরসা' বলে। দিনের বেশির ভাগ সময় মোল্লানমা তাকে নিয়েই কাটাতেন। নিজের কেউ ছিল না বলে কেউ তাঁকে বলেছিল গাছের বিয়ে দিলে পরজন্মে আপনজনে ঘর ভরে থাকবে। একটা বড় রকমের উৎসব হয়েছিল, পুরোহিতমশাইরা খুব ঘটা করে হোম যজ্ঞ পুজো করেছিলেন। বিয়েতে যেমন হলুদ সুতোয় দূর্বা দিয়ে বাঁধে সেই রকম লম্বা হলুদ সুতোয় দূর্বা বেঁধে, দুই প্রাচীন বিরাট অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধা হয়েছিল। এই অনন্য পূজা জীবনে একবারই দেখেছিলাম। স্মৃতির আলো-আঁধারে মেশা আবছা আবছা মনে পড়ে। পাড়ার সবাই এই বিয়েতে মোল্লানমায়ের উঠোনে বসে ভোজ খেয়েছিলাম। মস্ত বড় একটা জামগাছ ছিল মোল্লানমায়ের উঠোনে। তাতে যে ফল ধরত তা যেমন বড় আর তেমনি মিষ্টি। বেশির ভাগ সময় পাড়ার ছোটরা ওই বাড়িতেই পড়ে থাকতাম ওই সুস্বাদু রসে ভরা জামের লোভে। যখন ছেলেদের ইস্কুলে পড়ি একদিন কেউ এসে বাবাকে কী বলল, বাবা আমাকে নিয়ে বাড়ি এলেন, অনেক লোকজনে তখন মোল্লানমায়ের বাড়ি ভরে গেছে। বাবা তাঁর মুখাগ্নি করেছিলেন, শেষ কাজ শ্রাদ্ধও তিনি করলেন।

মোল্লানমায়ের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল বিরাজমায়ের কথা। বিরাজমা আমার মধ্যে তাঁর কল্পনার সন্তানকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আদরে ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখতেন আমাকে। সকালে যেভাবে হোক একবার আমাকে তাঁর কাছে যেতেই হবে। আমি গেলে বাক্স থেকে মাজা কাঁসার বাটিতে নিজে দুধ দুয়ে আমাকে খাওয়াতেন। ঈষদুষ্ণ সেই দুধের আস্বাদ আমার যত ভালো লাগে, তাঁর চোখে-মুখের পরিতৃপ্তি ততই সুন্দর মমতাময়ী এক মাতৃমূর্তিরূপে ধরা দেয়। গ্রাম্য এক মায়ের চোখ দিয়ে স্বর্গের মাধুরী ঝরে পড়ে। যা কিছু ভালো জিনিস আমার জন্য তোলা থাকে। পুজোয় নতুন জামা কিনে আমাকে না পরানো অবধি শান্তি নেই। থানপরা আমার বিরাজমায়ের বাড়িতে একজন থাকতেন তিনিও আমাকে স্নেহ করতেন। পরে জেনেছিলাম তিনি ব্রাহ্মণ। চাষিঘরের বিধবা বউ আমার বিরাজমায়ের পুকুর ছিল, জমিজমা ছিল, দুটো বাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বলতে কেউ ছিল না। ওই মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তাঁদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁরা এক সংসারে বাস করতে থাকেন। নতুন গড়ে ওঠা বোলপুরে সমাজের শাসন খুব একটা ছিল না। বহু দিন একসঙ্গে থাকার পরে বিরাজমায়ের মনে হয় তিনি ওই মানুষটির প্রতি অন্যায় করছেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে ঘরসংসার করেন। যৎসামান্য আয় মানুষটির, তাই এ প্রস্তাব তিনি মেনে নিতে চান না। বিরাজমা তাঁর যা কিছু সব লেখাপড়া করে তাঁকে দান করেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে বিয়ের ঠিক করেন। ঘটা করে বিয়ে দেন। তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তানটিকে তিনি কোলেপিঠে করে মানুষ করেন। বড় হলে উপনয়নের সময় তাকে ভিক্ষাপুত্র করেন। ভালোবাসার মানুষটিকে যথাসর্বস্ব দিয়ে নিজের বাড়িতে এক অভ্যাগতের মতো বাস করতে থাকেন। মেয়ে হয়ে জন্মেছি; সর্বস্ব ত্যাগ করে নিজের সবচেয়ে প্রিয়জনকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারা যে কত কঠিন তা বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি। তাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে গভীর শ্রদ্ধাভরে আমার মহৎ-হৃদয় বিরাজমাকে বারবার প্রণাম জানাই।

ভাইবোন হারানো

আমাদের ছোট্ট সুন্দর ফরসা বোনটি একটু একটু করে বড় হতে লাগল। একমাথা ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়া চুলে ছাওয়া ফুলের মতো মিষ্টি মুখখানি সদাই হাসিতে ভরা। হামা দিয়ে দিয়ে সারা উঠোন ঘুরে বেড়াত। আধো আধো বুলিতে কথা বলত। ওর 'ফরসা' নামটা কেন জানি না আর কেউ বলত না। সব্বাই ওকে ইলা বলে ডাকত। লাল রঙের চেলি পরিয়ে কপালে চন্দন, হাতে দুটি ছোট্ট সোনার বালা, আসনে

বসিয়ে একদিন দাদু তাকে ভাত খাইয়ে দিলেন। তার (অন্নপ্রাশন) ভুজ্‌নোর দিনে, এখন যাকে পূর্বপল্লি বলে সেই মাঠে এরোপ্লেন নেমেছিল। বিকেলে ছোট্ট বোনটিকে নিয়ে বাড়ির সবাই এ-যুগের পুষ্পক-রথ দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম রাবণের পুষ্পক-রথের সঙ্গে আধুনিক এই আকাশযানের কোনও মিল নেই। বড় দুটি ডানা আর ছোট ছোট চাকা দেখেই যেটুকু ধারণা হল। ভেতরে কী আছে তা তো আর দেখতে পেলাম না। বোলপুরের মানুষজন ভেঙে পড়েছিল উড়োজাহাজ দেখতে।

এর কিছু দিন পরে যখন আধো আধো বুলিতে বোন সে-সব কথা বলতে পারছে, ওকে নিয়ে আমাদের যখন খুশির সীমা নেই, তখন ওর জ্বর হল। মুখ-চোখ লাল, কিছু খেতে পারছে না। অ্যালোপ্যাথি, হোমিয়োপ্যাথি, কবিরাজি সব চিকিৎসাই নিষ্ফল হল। তখন যে যা বলেছে হাতামুঠো তাই করা হচ্ছে, ময়ূরের পাখা পুড়িয়ে সেই ছাই মধু দিয়ে খলে মেড়ে একটু একটু করে খাওয়ানো হচ্ছিল। মৃগনাভির ভিতরে এলাচদানার মতো থাকে, তাও খলে মেড়ে খাওয়ানো হচ্ছিল। কিছুই কাজে লাগল না। তার যন্ত্রণাকাতর মুখখানি দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও কিছুতেই কোনও উপশম হল না। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ঘরের মধ্যে বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছে। মা কাঁদছেন আর বোনটি নিথর হয়ে পড়ে আছে। আমরা দুই বোনে কাঁদছি। বাবা বললেন, তোরা কাঁদিস না। স্বর্গের শিশু যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে। তোরা কাঁদলে ওর পিছুটান হবে। শান্তিতে ওকে যেতে দে। সবাই কাঁদতে কাঁদতে একদিন থেমে গেল। মায়ের চোখের জলের ধারা বয়ে যেতে লাগল। কোনও দিকেই মন দিতে পারেন না। অশ্রুমুখী হয়েই দিন কাটান। আমার মেজপিসিমার ইলার বয়সি একটি মেয়ে ছিল, তাকে একদিন বাবা মায়ের কোলে তুলে দিলেন, "আজ থেকে অন্নকেই (অন্নপূর্ণা) তোমরা ইলা মনে করবে।" বাদল বর্ষার পরে অন্নই আমাদের ছোট বোন হয়ে রয়ে গেল।

বেশ কিছু দিন পরে অন্য এক রাতে ঘরের মধ্যে অনেকের গুঞ্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুই বোন উঠে বসলাম। শুনলাম একটি খুব সুন্দর ভাই হয়েছিল আমাদের, ধরার মাটিতে এক ঘণ্টা কাটিয়ে সে চলে গেছে অন্য লোকে। কান্নায় ভেঙে পড়া মায়ের শোকার্ত মূর্তি ঘুমভাঙা চোখে দেখে বাবার কোলের কাছে দুই বোন হতভম্ব হয়ে রইলাম। তার পরে আমরাও চোখের জলে ভাসলাম। বাবার চোখে শোকাশ্রু কখনও দেখিনি। শান্ত সমাহিত চিত্তে যে-কোনও দুঃখ তিনি সইতে জানতেন।

বাড়ির বড়রা

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯২০ থেকেই বাবা শামিল হয়েছিলেন। আন্দোলনের সঙ্গে সব সময়েই যুক্ত ছিলেন, কিন্তু কোনও দিন বাবার জেল হয়নি। দাদু অধরচন্দ্র রায় রাজভক্ত ছিলেন। বোলপুর ও জেলার সকল রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট তাঁকে সেই ফুলে পুজো দিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন। বাবার তাই জেল হয়নি।

দাদুর সঙ্গে বাবার মিল ছিল না কোনও কিছুতেই। দাদু চেয়েছিলেন বাবা আইন পাশ করে এসে বর্ধমানে ওকালতি করুন। কিছু দিন বাবা করেও ছিলেন ওকালতি, কিন্তু ভালো লাগল না। ধাতে সইল না। ফিরে এসে ঠাকুমাকে জানান তাঁর দ্বারা হবে না ওই কাজ।

বোলপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। ঘোর বিষয়ী জবরদস্ত আমার দাদুর প্রতাপে তখনকার বোলপুরের বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত কিন্তু নিজের এই ছেলেকে কোনও দিন তিনি বাগে আনতে পারেননি। বোলপুর স্কুলে শিক্ষকতায় যখন থিতু হলেন তখন দাদুকে তাই মেনে নিতে হয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকা তাঁর অত্যন্ত অপছন্দ ছিল কিন্তু বাবাকে এ থেকে বিরত করতেও কোনও দিন পারেননি। তার উপরে বাবা যে আমার মাকে আক্ষরিক অর্থে সহধর্মিণী করেছিলেন তাতেও তাঁর বিরক্তি ও আপত্তির সীমা ছিল না। সবরমতী, বগুড়া ও কলকাতার খাদি প্রতিষ্ঠানে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক অঘোষিত যুদ্ধও নিরন্তর চলছিল। পরে জাতীয় আন্দোলনের সকল স্তরে বাবার সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা আর মায়ের অন্দরমহল থেকে মাঝেমধ্যেই পথে নামা তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। সবচেয়ে আদরের ছেলের উপর দাদুর বিরূপ মনোভাবে অন্তরে গভীর বেদনা নিয়ে ঠাকুমা সব সময় বাবা-মাকে দাদুর কাছে আড়াল করতে চাইতেন। বাইরে থেকে আসা বাবার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গীদের যখনই পারতেন যতটা পারা যায় যত্ন করতেন। বলতেন, "ওরা বাবা-মা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে কত কষ্ট সইছে দেশের মানুষের ভালো করবে বলে। ওদের সেবা করলে আমাদের মঙ্গল হবে, পুণ্য হবে।" তাঁর হার্টের অসুখ ছিল তাই কাজকর্ম বিশেষ করতেন না। আমাদের খুব ভালোবাসতেন। আঁচলে বাঁধা থাকত বড় এলাচ। কবিরাজমশাই বলেছিলেন, হার্টের দুর্বলতায় বড় এলাচ খেলে রোগ প্রশমিত হবে। তিনি নিজে খেতেন আর আমাদের সবাইকে দিতেন। বাড়ির গৃহিণী ছিলেন বড়মা (পিসিমা)। তাঁর ৮ বছর বয়সে ১৪ বছরের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বছর ঘুরতেই নেমে আসে দুর্ভাগ্য। ৯ বছর

বয়সেই বৈধব্য হয় তাঁর। শিশুকাল থেকে ন্যাড়ামাথা থানপরা বড়মাকে দেখে এসেছি। যেমন তাঁর কাজ করার ক্ষমতা ছিল তেমনই তাঁর প্রতাপ। গলার জোরে সবাইকে চুপ করিয়ে রাখতেন। নিঃসন্তান বড়মার অনেক সম্পত্তি ছিল। তিনি জীবনস্বত্ব ভোগ করার অধিকার পেয়েছিলেন। আমাদের বিশেষ আসক্তি ছিল তাঁর বাগানের আমের। খাওয়ার সময়ে কাঁচা আমের মিষ্টি চাটনি। আমঝোল খেতাম। পাকা আম যখন আসত একটা ঘর ভর্তি থাকত আমে। জানতাম আমরা খেতে পাবই, তবু চুরি করে খাওয়ার মজাই আলাদা। পাকা আমের গন্ধে ম' ম' চারিদিক। বেশি খেয়ে পাছে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই শেষ অবধি পাকা আমের ঘরে তালা দেওয়া হত।

নানা মজা

গরমের নিঝুম দুপুরে জানলা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে শুয়ে থাকতে হত। তার মধ্যেই বড়দের চোখ এড়িয়ে দেশি খেজুর খেতে বেরোতাম। দুপুর পার হলেই মা হয়তো বেলের পানা তৈরি করতে বসতেন, আখের গুড় আর পাকা তেঁতুল একটু দিয়ে অনবদ্য সেই পানীয়ের নিজের ভাগটি পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম। কোনও দিন কাঁচা তালের কাঁদি কেটে নামিয়ে রাখত কেউ। তার মুখ কেটে তালের গায়ে মুখ লাগিয়ে আঙুল দিয়ে শাঁস ও জল বের করে খাওয়া, সে আনন্দ কোনও দিন ভোলার নয়। বিশেষ করে আমাদের শিশুবাহিনীর সর্বদা একত্রে থাকা আর সব কিছু ভাগ করে খাওয়ার মন ভরানো খুশি আজকের ছোট পরিবার সুখী পরিবারের শিশুদের বোধের বাইরে।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে সরকারদাদুদের বাড়ি। সেই বাড়ির পাশ দিয়ে সরু গলি দিয়ে ওদের ডোবার পাড় ধরে এগিয়ে গেলে মস্ত একটা পুকুর, তার নাম শুঁড়িপুকুর। উত্তর দিকে বিশাল দুটো অশ্বত্থ গাছ, পশ্চিম দিকে খুব বড় একটা শিমুলগাছ, শীতকালে সে ন্যাড়া। বসন্তকালে অজস্র বড় বড় লাল ফুলে ছেয়ে যেত গাছটা। পরে যখন ফল পেকে নরম তুলো বিচির সঙ্গে ফেটে ফেটে পড়ত, ভারি মজা লাগত সেগুলো নিয়ে খেলতে।

পরে যখন সংস্কৃত পড়ি 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশালঃ শাল্মলী তরু', মনে পড়িয়ে দিত ওই গাছটাকে। একটা শ্যাওড়া গাছ— তার ঘন সবুজ রঙের পাতার ছাউনি জড়ানো থাকত একটু মোটা সোনালি রঙের সুতো দিয়ে। দেখতে খুব ভালো লাগত। পরে জানলাম তার নাম স্বর্ণলতা বা আলোকলতা। সে-দিনের সেই শুঁড়িপুকুরের পাড় চারপাশের ঝোপঝাড় বনবাদাড় আমাদের খুব প্রিয় ছিল। পশ্চিম

পাড়ের ঘাটের কাছে একটু ওপরে একটি বাঁধানো তুলসীমঞ্চ ছিল তার কিছুটা দূরে একটা গাছ ছিল তাতে আমরা সহজেই উঠতে পারতাম। সাদা রজনীগন্ধা ফুলের মতো সুগন্ধি থোকা থোকা ফুল ঝুলে থাকত। নাম তার কাঠমল্লিকা। অন্য কোনও নাম হয়তো তার থাকতে পারে, আমরা তাকে ওই নামেই চিনতাম। মজার দেখতে ছিল তার ফলগুলো। এবড়োখেবড়ো তোবড়া, কেমন যেন অদ্ভুতদর্শন। লোকে বলত গণ্ডগোলে ফল, কারও বাড়িতে ফেলে দিলে তাদের বাড়িতে ঝগড়া লাগবেই। আমরা অবশ্য পরখ করে কখনও দেখিনি। চারদিকে ছিল বনতুলসীর ঝোপ। কাঁটাভরা পাতাগুলো বেগুনফুলের মতো ছোট্ট ছোট্ট ফল, নাম কন্টিকারি। মাঘ মাসের শেষে মা এর শিকড় সংগ্রহ করে কয়েকটা গোলমরিচ দিয়ে বেঁটে বড়ি করে হাম-বসন্তের প্রতিষেধক হিসেবে সবাইকে খাওয়াতেন। আমরা খুঁজে বেড়াতাম শেঁয়াকুলের ঝোপ। একেবারেই কুলের পাতার মতো ছোট ছোট পাতা, কাঁটাভরা ডালগুলো আর ফলগুলো পাকলে টক-মিষ্টি খেতে। সেগুলি সংগ্রহ করে সবাই মিলে ভাগ করে খেতাম। বনতুলসীর শিষগুলো ঝেড়ে বিচিগুলো কারও বাড়ি থেকে ছোট মাটির ভাঁড় কিংবা নারকোলের শুকনো মালায় ভিজিয়ে রেখে রান্না করা সাবুর মতো ফুলে উঠলে সুন্দর একটা গন্ধ বের হত। সবাই মিলে চেখে চেখেই আমাদের মন ভরে যেত। শুঁড়িপুকুরের পশ্চিম দিকে ছিল বিস্তীর্ণ ধানখেত। কাছাকাছি মাঠে গম যব আলু আখ ছোলা সরষে এই সব চাষ হত। আখের ভুঁয়ে ঢুকে অ। । ভেঙে কখনও খাইনি তবে ছোলাগাছের শুঁটিগুলো যখন বেশ পুরুষ্ট হত তখন চুপিচুপি সবুজ মিষ্টি দানাগুলো খেতে দারুণ লাগত। শুঁড়িপুকুরের জলে নেমে কাদা-মাটি-বালি তুলে এনে নিজেদের খেলাঘরের দেয়াল তোলা হত আর ছোট ছোট থালা বাটি গেলাস, পুতুলও তৈরি করা হত। পুতুলদের বনতুলসী পাতার লুচি খাওয়াতাম আর নিজেরাও সেই লুচি খেয়ে মজা পেতাম। ঝগড়াঝাঁটি হত না তা নয়, তবে যে বড় তার কথা মেনে চলতে হবে এই অলিখিত নিয়মটি চালু ছিল।

পাড়ায় কখনও কেউ বাঁদর খেলাতে আসত, আবার ভালুক নিয়েও খেলাতে আসত। আমরা পাড়ার ভিতরে সব বাড়িতে ওদের পিছনে পিছনে দল বেঁধে ঘুরতাম।

মাঝে মাঝে বহুরূপী আসত এক-এক দিন এক-এক মূর্তি ধরে। কোনও দিন শিব-দুর্গা, এক অঙ্গে শিব অন্য অঙ্গে দুর্গা। কোনও দিন, পুলিশ কোনও দিন কাবুলিওয়ালা। শুধু রূপ ধরাই নয় অভিনয়ও করত তার সাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার পিছু পিছু আমরাও ঘুরতাম। যে দিন রাক্ষসী সাজত সে দিন বড় বড় দাঁত আর বিশাল রক্তমাখা জিভ দেখে বড়ই ভয় পেতাম। লুকিয়ে থাকতাম ঘরের কোণে।

সাপুড়েরা আসত অনেক রকম সাপ নিয়ে। কালকেউটে (কেলে) বা গোখরো (খরিশ) তাদের ফোঁসফোঁসনি শুনে ভয় করত কিন্তু দেখতে ছাড়তাম না। বাড়ির আশেপাশে আমরা সাপ দেখতে পেতাম প্রায়শই। বেশিরভাগ চিতি সাপ। পথের ধারে সিঁড়ির কোণে বারান্দায় জানলার ফাঁকে হঠাৎ তাদের দর্শন মিলত। সন্ধে হলে সাপের ভয় পেলেই জোরে জোরে হাততালি দিয়ে মায়ের শেখানো মন্ত্র আওড়াতাম—

আস্তিক কশ্যপ মুনেঃ মাতা জরৎকারু বাসুকীস্তথা
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমস্ততে।।

ঢোঁড়া হলহলে ঢেমনা মেটেলি এই সব নির্বিষ সাপ দেখে আমরা মজা পেতাম। বিশেষ করে মেটেলি সাপের পেট মোটা দেখলেই আমরা খানিকটা গোবর এনে ওর পেট লক্ষ্য করে জোরে ফেলে দিতাম, আর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে একরাশ সাপ বেরিয়ে আসত। মায়ের পেট থেকে বার হয়েই ওরা এ দিক-ও দিক ছুটত। শিশু সাপগুলির আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা দেখে মনে হত এ যেন ওদের জীবনযুদ্ধ। সবুজ রঙের গাছের গায়ে মিশে থাকা লাউডগা সাপেরও দেখা মিলত যখন-তখন। একবার একজোড়া খরিশ সাপ একসঙ্গে জোড় বেঁধে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দেখে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেল। একজন বলল, "শঙ্খ লেগেছে", বলেই ছুট লাগাল নতুন কাপড় আনতে। সেই নতুন কাপড় সন্তর্পণে পেতে দেওয়া হল। সাপ দুটি তার উপর এসে ওইভাবেই খেলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তারা চলে গেলে সেই কাপড়ের টুকরো অতি যত্নে তুলে রাখা হল। তখনকার মানুষের বিশ্বাস ছিল ওই কাপড় পবিত্র মন্ত্রপূত বস্তুর মতো। আগুন লাগলে ওই কাপড় ফেলে দিলে তা নিভে যাবে। যে কোনও বিশেষ কাজে কাপড়ের টুকরো সঙ্গে নিলে সাফল্য আসবেই। তার অন্য দিকও ছিল, যদি কাপড়ের টুকরো পেতে দিলে তাদের শঙ্খবন্ধন ভেঙে যায়, তা হলে যার কাপড় তার সমূহ বিপদ হয়।

বাড়ির পাশে আরশিনগর

মাঝে মাঝে কিছু লোক আসতেন, তাঁদের সঙ্গে জড়ানো পট দু'পাশে দুটি কাঠি দিয়ে আটকানো থাকত। তাঁদের সবাই বলত পোটো বা পটুয়া। হাতে জড়ানো পটটিকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে খোলা হত, আবার অন্য হাতে জড়িয়ে একটু একটু করে গুটিয়ে নেওয়া হত। পট দেখাতে দেখাতে তাঁরা নানান পৌরাণিক কাহিনি সুর করে গেয়ে যেতেন। রাম-সীতার গল্প, ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা। সাবিত্রী-সত্যবানের অমর জীবনের কথা এই সব বলতে বলতে তাঁরা চলে আসতেন সাধারণ মানুষের কথায়। যারা

ভালো লোক, সৎ, পুণ্যময় জীবনযাপন করে, তারা মৃত্যুর পরে স্বর্গে আনন্দময় জীবন পায়। যে সব অসৎ মানুষ অপরাধের জীবন কাটায়, মানুষের ক্ষতি করে, তাদের নরকে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হয়। অনেক রকম অপরাধের কাহিনি ও তাদের উচিত সাজার ছবি দেখিয়ে, গান গেয়ে গেয়ে মানুষের মনে তাঁরা এঁকে দিতে চান ভালো-মন্দর রীতিনীতি। খারাপ লোকেদের আমরা মোটেই পছন্দ করতাম না, অথচ নরকে তাদের যে ধরনের শাস্তির ছবি থাকত তা আমাদের ভালো লাগত না। যার যত দোষই থাক তাই বলে তাদের জিভ কেটে দেবে, গরম ফুটন্ত তেলের উপর ঝুলিয়ে রাখবে, চোখ উপড়ে নেবে। এই সবে আমাদের মন কিছুতেই সায় দিত না। তাঁদের সঙ্গও ছাড়তাম না। ছবি দেখিয়ে গান গেয়ে পটের সব কথা যখন বলা হয়ে যেত, তখন তারা বলত "জয় হোক মা, সকলের ভালো হোক।" গৃহস্থরা চাল ডাল পয়সা যার যেমন সাধ্য তাঁদেব হাতে দিয়ে খুশি করতেন। আমরা যথারীতি তাঁদের পিছনে পিছনে সব বাড়িতেই ঘুরে বেড়াতাম।

বাউল বৈষ্ণবরা আসতেন খঞ্জনি আর গাবগুবাগুব হাতে। 'জয় রাধেকৃষ্ণ ভিক্ষে পাই মা' বলে দুয়ারে দাঁড়াতেন। বাউলের গায়ে অনেক রঙের তালি মারা আলখাল্লা আর বোষ্টমির পরনে সরু পাড় সাদা ধুতি, চুলটা উজিয়ে নিয়ে মাথার উপর চুড়োঝুঁটি বাঁধা, কপালে তিলক নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা। ওঁরা এলেই সবাই গান শুনতে চাইত। মা যশোদা আর তাঁর নন্দদুলালের বাৎসল্য-লীলার গান। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিবহ-মিলনের মাধুরী মাখানো গান। বাড়ির সবাই কাজ ফেলে জড়ো হত গান শুনতে। আমরা ঘুরে বেড়াতাম ওঁদের সঙ্গে পাড়ার সকলের দোরে দোরে। এক-এক বাড়িতে নানা রসের নানা সুরের অনেক গান তাঁবা গাইতেন। আমাদের মন ভরে যেত। ওঁদেব সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ ভাব জমে উঠল। ওঁরা ওঁদের আখড়ায় আমাদের যেতে নিমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের পাড়া থেকে কাছারির পাশের পায়ে চলা পথ ধরে, রেললাইনের নীচের ছোট সাঁকো মাথা নিচু করে পাব হয়ে বোলপুরের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে ছিল সেই আখড়া। আমরা সাঁজপুজুনির ফুল তুলতে ও দিকে গিয়েছি, কিন্তু অত দূরে কোথাও যাইনি। একদিন বিকেলের দিকে খুঁজে খুঁজে পৌঁছে গেলাম আখড়ায়। আখড়ার সামনে মস্ত এক পুকুর গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগরের জলে পদ্মফুল, কুঁড়ি আর পদ্মপাতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। বহু দিন পরে আমাদের শুঁড়িপুকুরও একদিন কমলকলিতে ছেয়ে গিয়েছিল। আখড়ায় শান্ত পরিবেশে তাঁদের কুটির। সামনে মস্ত এক কদমফুলের গাছ। গাছের চারিদিকে জড়িয়ে আছে মালতীলতা। সাদা নরম ছোট ছোট ফুলেব

মিষ্টি সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে আছে চারিদিক। তাঁরা আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। আদর করে ঠাকুরের প্রসাদি বাতাসা ও জল খেতে দিলেন। তুলসীমঞ্চের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আয়তনে বেশ বড় তুলসী গাছটি মঞ্জরীতে ছেয়ে আছে। আঙিনাটি নিকোনো-চুকোনো পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। চারপাশ ঘুরে ঘুরে আমরা দেখতে লাগলাম। এক কক্ষে কতকগুলি ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট মাটির ঢিবি। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আখড়াবাসীরা তুলসীমঞ্চ ও ঢিবিগুলিতে প্রদীপ জ্বালাবার আয়োজন করছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "ওই ঢিবিগুলি কীসের?" উত্তরে ওঁরা বললেন, "ওঁদের মধ্যে যাঁরা একদিন ছিলেন সেই আপনজনদের বিদেহী আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগের পর মাটির তলায় শায়িত আছেন। এগুলি তাঁদের সমাধি। প্রতিদিন সকালে তাঁদের স্মরণ করে সমাধিতে ফুল দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁদেরকে স্মরণ-মনন করা হয়।" আঁধার হয়ে আসছে দেখে আমরাও ঘরে ফেরায় মন দিই। এখানে এসে মন আমাদের পবিত্র হয়ে উঠল পরিবেশ মাহাত্ম্যে।

মাঝে মধ্যে বোলপুরে একদল মানুষ আসত, যারা খুঁজে খুঁজে যেখানে বসতি নেই সেখানে তাঁবু টাঙিয়ে বাস করত। তাদের দেখতে আমাদের মতো নয়। রোদেপোড়া লালচে ফরসা রং, চোখের তারা নীল। মেয়েদের কটা-চুলের দুটো লম্বা বিনুনি। পোশাকও অন্য ধরনের। উর্ধ্বাঙ্গে টাইট জামা, মস্ত ঘেরের ঘাঘরা, গলায় নানা রঙের মোটা মোটা কাচের পুঁতির মালা, হাতে কাচের রং-বেরঙের চুড়ি। পুরুষদের টাইট পাজামা আর ফতুয়া পরনে। ছুরি কাঁচি লিবে গো বলে ডাক দিয়ে দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। অনেক রকম শিকড়-বাকড় গাছের ছাল ওষুধ বলে ওরা আনত। কেউ কেউ বিশ্বাস করে কিনত। সবাই বলত ওরা ইরানি বেদের দল। মায়েরা ওদের দেখে ভয় পেতেন, ওদের দেখে দূরে থাকতে বলতেন আমাদের। মায়েদের ধারণা ছিল ওরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওদের দল ভারী করে অথবা নিঃসন্তান মানুষদের কাছে বেচে দেয়। ওদের দেখতে পেলে লুকিয়ে পড়াই রীতি ছিল আমাদের। সামনে থেকে দেখতে বাধা ছিল বলেই লুকিয়ে চোরাচোখে ওদের যতটা পারা যায় দেখতাম, কখনও রাস্তায় দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যে-কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়তাম। সে বাড়ির আনাচে-কানাচে গোপন কোথাও লুকিয়ে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব লুপ্ত করে নিঃশব্দে দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকতাম। সে বাড়ির কাকিমা বা বউদি হাঘরেদের পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার বার্তা ঘোষণা করলে যে যার নিজের বাড়িতে পৌঁছে যেতাম।

নাগা সন্ন্যাসীরা আসত, তাদের সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, এক টুকরো কাপড়ের আবরণ ছাড়া সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত। হাতে থাকত একটা দণ্ড। 'অলখ্ নিরঞ্জন' বলে উচ্চ কণ্ঠে একটা ডাক দিয়ে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও দ্বিতীয়বার তারা কথা বলত না। যে যা দিত তাই নিয়ে চলে যেত। তাদের কাছ থেকে ভয়ের কিছুই ছিল না, তবু কেন জানি না আমাদের ভয় করত। বাড়িতে এলে এক রকম। পথে দেখতে পেলে ভীতির সীমা থাকত না। আমাদের চোখে ওদের ছাইমাখা নিরাবরণ দেহ, একটি মাত্র উচ্চারিত শব্দ 'অলখ্ নিরঞ্জন'— সবই অচেনা অদ্ভুত লাগত। 'অলখ্ নিরঞ্জন' ভগবানের নাম, তবু আমাদের বোধহীনতাই সেই নাম শুনে আমাদের মনে অন্য ভাব এনে দিত। ডাকবাংলোর মাঠের আগে যে শিবমন্দির ছিল সেখানেই এরা বাস করত।

তখনকার যে-কোনও গৃহস্থবাড়িতে 'হরিবোল' বলে কেউ এসে দাঁড়ালে একমুষ্টি চাল দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সাধারণত কেউ ওদের ফিরিয়ে দিত না। একমাত্র মায়েরা কাজে খুব ব্যস্ত থাকলে "ফিরে এসো বাবা, হাতজোড়া আছে" বললে তাঁরাও কিন্তু নীরবে ফিরে যেতেন। সকাল থেকে দুপুর অবধি দরজা তাদের জন্য খোলাই থাকত। কত রকমের মানুষ আসত কত সাজে, কোনও অন্ধ মানুষকে হাত ধরে নিয়ে আসত কেউ, বলত, "দুটি ভিক্ষে পাই মা"। মাথায় জটা তাতে চওড়া করে লেপা সিঁদুর, পরনে গেরুয়া শাড়ি, হাতে ত্রিশূল, তাদের সবাই বলত ভৈরবী। মুসলমান ফকিরও আসত, কখনও হাতে তাদের তসবি। অনেক সাধু আসত, মানুষ তাদের সম্মান করত। কখনও হাত দেখিয়ে বা অন্য কোনওভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে চাইত। বাড়ির কারও কঠিন অসুখ থাকলে তাদের নিরাময়ের জন্য সাধুবাবাদের করুণা ভিক্ষা করা হত।

একবার দুটি অল্পবয়সি সাধু আমাদের বাড়িতে এসেছিল। জন্মের পরেই আমাদের ভাইটির মৃত্যু হয়। মায়ের মনে পুত্রসন্তানের জন্য আর্তি ছিল। সাধু দুটি মাকে দেখেই বলল, "আমাদের দুটি হরীতকী দাও।" হরীতকী ছাড়াও মা তাদের জন্য চাল ডাল আনাজ দিয়ে সিধে দিয়ে প্রণাম করল। তারা মাকে বলল, "মাই তুমি খুব ভালো। ছেলে নেই বলে দুঃখ কোরো না। তোমার তিনটি ছেলে হবে।" অনেক দিন পরে সেই বালক সাধু দুটির কথা সত্যি হয়েছিল। তখনকার দিনের মানুষ 'অতিথি নারায়ণ' বিশ্বাস করত। আগন্তুক সাধুদের গরম চাদর কম্বল ও শীতবস্ত্র অনেকেই দান করত।

একজন সাঁওতাল বৃদ্ধ আসত। তার হাতে একটা লাঠির উপর সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা একটা ঘরের মতো থাকত। নীচে সুতো টানলে সাঁওতাল মেয়ের দল তালে তালে 'দুলে দুলে নাচত আর পুরুষের দল মাদল বাজাত। সব শেষে মাঝখানে ওদের

ভগবান 'মারাং বুরু' উঠে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিতেন। এ দেখতেও আমরা ভিড় করে দাঁড়াতাম, আর তার পিছু পিছু পাড়ায় ঘুরতাম।

একবার বোলপুরে গণপতির সার্কাস এসেছিল। আমরা একদিন সব ছোটরা বড়দের সঙ্গে সার্কাস দেখতে গেলাম। একমনে আমরা যখন ট্রাপিজের খেলা দেখতে দেখতে তাদের দোলদোলানির মধ্যে ডুবে গেছি, হঠাৎ শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। গুরু গুরু মেঘের গর্জন আর আকস্মিক বিদ্যুতের ঝলকানি সবাইকে সচকিত করে দিল। প্রবল হাওয়ার বেগে এবার শুরু হল শিলাবৃষ্টি। এ-দিকে ও-দিকে কোথায় কোন ফাঁক দিয়ে শিলাগুলো পায়ে পড়তে শুরু হল আমাদের ঠকঠকিয়ে কাঁপুনি। এরই মধ্যে শিলার আঘাত খেতে খেতে বাড়ি ফেরা কোনওদিনও ভুলব না। অরণ্যের বলশালী হিংস্র পশুদের বশে এনে চাবুক মেরে মেরে খেলা দেখানো আমার নিজের একটুও ভালো লাগেনি। অরণ্যে যারা স্বাধীন ও মুক্ত তারা মানুষের নির্মম অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে তামাশা দেখাতে বাধ্য হয়।

মাঝে মাঝে অষ্টপ্রহর হত। অষ্টপ্রহর মানে অষ্টপ্রহর ধরে হরিনাম সংকীর্তন। ভক্ত বৈষ্ণবরা খোল করতাল খঞ্জনি সহযোগে ও বহু মানুষ একত্রে উচ্চৈস্বরে হরিনাম গান করতে করতে যেত, তাদের সঙ্গে দুটি ছোট ছেলেকে রাধা ও কৃষ্ণ সাজিয়ে সামনে রাখত। এত সুন্দর করে সাজাত যে সত্যিকারের জীবন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বলেই মনে হত। কৃষ্ণের মুকুটে সত্যিকার ময়ূরপুচ্ছের শিখিপাখা হাতে বাঁশি কপালে চন্দনের অলকা-তিলকা পীতবসন আর রাধারানি নীল রেশমের শাড়িতে কেয়ূর কঙ্কনে গলায় সাতনরী মুক্তোর হারে নূপুরে শিরোভূষণে (যদিও সবই নকল) সত্যিকার একটি ছোট্ট রাজনন্দিনীই যেন। তার হাতে একটি ছোট থালা, যে যেমন পারছে প্রণামী দিচ্ছে তাতে। মোড়ে মোড়ে বাড়ির মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকতেন হাতে ডালায় বাতাসা ছড়িয়ে দিতেন। কাড়াকাড়ি করে সবাই পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সেই প্রসাদি বাতাসা খেত, আমাদের ভাগ্যেও এক-আধটা জুটত। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হলে তখনকার দিনে সবাই হরিসংকীর্তন করতে করতে পাড়া প্রদক্ষিণ করত। সেই সময় কেউ পান বা আহার করত না। কোনও বাড়ি থেকে শাঁখ বেজে উঠত বার বার। যারা বাইরে বার হত না, একমনে তারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করত অথবা শান্ত হয়ে বসে ধ্যান-জপে একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকত। সূর্যগ্রহণের সময় অনেকে কাচে ভুসো পরিয়ে তাব ভেতর দিয়ে সূর্যের ক্ষীয়মাণ দৃশ্য পরে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা একমনে দেখত। গ্রহণের আগেই সবাই খেয়ে নিত, কারণ তার পরে চান না করে কেউ কিছু মুখে দিত না। রান্না খাবার কিছু থাকলে সব ফেলে দেওয়া হত।

খাওয়ার জল, দুধ বা দই থাকলে তাতে তুলসীপাতা দেওয়া থাকত। গ্রহণের শেষে সারা বাড়ি জল ঢেলে ধুয়ে মুছে নেওয়া হত। চাঁদ বা সূর্যকে রাহু গিলে ফেলে এবং পরে তাকে উগরে দেয় এই গল্প সবাই গভীরভাবে বিশ্বাস করত। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হলে কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার নেমে আসে। আকাশে তারা দেখা যায়। একবার এই রকম এক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিনে সবাই হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত করছে আকাশ-বাতাস, এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল তখন রাস্তার ধারের এক বারান্দায় সকলে আশ্রয় নিল। হরিনাম-গান চলতেই লাগল। বৃষ্টির তোড় এত বেশি ছিল আধঘণ্টার মধ্যে রাস্তা জলে ভাসতে লাগল। পুকুরে-রাস্তায় এক হয়ে গেল। একটু পরে রাস্তায় বড় বড় মাছ উঠে আসতে লাগল। সেখানে যারা ছিল তারা কেউ কেউ সেই মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল। দাদু তাই দেখে খুব ধমকধামক করলেন। তখন সবাই তা থেকে বিরত হল। সবাই বারান্দায় উঠে বসল, তবে তাদের অনেকেই হরিনাম করতে আনমনা হয়ে পড়ল, মাছেদের দিকে তাদের দৃষ্টি রইল। কেউ কেউ লুকিয়ে দু'চারটে মাছ ধরে ফেলল বলেই মনে হল।

পৌষল্লায় নির্মলকাকা

পৌষমাসে ধানকাটা হয়ে গেলে একদিন আমাদের মাঠে খাওয়া হত। তাকে বলত পৌষল্লা। অনেক ইট দিয়ে বড় বড় উনুন তৈরি হত। পেল্লায় পেল্লায় হাঁড়ি কড়া সব আনা হত। পাড়ার সবার একসঙ্গে খাওয়ার আয়োজন হত। খিচুড়ি বেগুনভাজা, আলু ফুলকপির তরকারি। সকাল ন'টা-দশটার সময় মুড়ি বেগুনি বোঁদে জলখাবার। বড় শতরঞ্চি পেতে একসঙ্গে বসে নানা রকম খেলা গল্প বলা বা শোনায় সময় কেটে যেত। একবার আমার গান্ধীবাদী বাবার বন্ধু ও সহকর্মী নির্মলকুমার বসু (আমার কাকাবাবু) পৌষল্লায় উপস্থিত ছিলেন। উনি খুব ভালো ফোটো তুলতেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে কত রকমের ছবি তিনি তুলেছিলেন। একটা ছোট বাক্স তার সামনে কাচ দেওয়া থাকত। অনেকটা ক্যামেরার মতোই দেখতে। কাচের ভিতর ছবিটা পরিয়ে দিয়ে পেছনের ছোট্ট ফোঁকরে চোখ রাখলে ছবিগুলো বড় হয়ে দেখা দিত। প্রকৃতি মানুষ আর মন্দির এই ছিল তাঁর বিষয়বস্তু। কত বিচিত্র সেই সব ছবি আমরা দেখছিলাম। কত বিশাল আমাদের এই দেশ আর কী বিস্ময়কর তার বৈচিত্র্য! বহু আদিবাসী আছেন আমাদের প্রতিবেশী, প্রদেশভেদে ভিন্ন তাঁদের জীবনযাত্রা। কত মহান শিল্পসমন্বিত অপূর্ব সব মন্দির। আমাদের ভাস্কর চিত্রকর বাস্তুকার আর

শ্রমজীবীরা একমন একপ্রাণ হয়ে কী গভীর নিষ্ঠায় একযোগে এই রকম গৌরবময় কাজ করে গেছেন ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় আর গর্বে মন ভরে যায়। বোলপুরের বাইরে যে কত বিরাট একটা জগৎ আছে, আমরা ছোটরা ছবিতে তার আভাস পেয়ে ধন্য হয়ে যাই।

জয়দেবের মেলা

মকর সংক্রান্তির দিনে জয়দেব কেন্দুলীতে মেলা হয়। সেই দিনে কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয়, এ কথা সকলে বিশ্বাস করতেন। ঠাকুমা বললেন আমরা জয়দেবে মকর-স্নান করতে যাব। দাদুর তখন নন্দেশ্বরী বলে একটা বাস ছিল। বোলপুর থেকে সাঁইথিয়া যাতায়াত করত। সাঁইথিয়ার নন্দেশ্বরী ঠাকুরানির নামে বাসের নাম রাখা হয়েছিল আর ড্রাইভারের নাম ছিল নীলমণি। আমরা বলতাম নীলমণিকাকা। বাড়ির পাড়ার অনেকে মিলে যাওয়া হচ্ছিল। মাঝপথে ইলামবাজারের কাছে চৌপাহাড়ির জঙ্গলের মাঝখানে বাস খারাপ হয়ে গেল। নীলমণিকাকা আর তার সহকারী অনেক চেষ্টা করেও বাসের ইঞ্জিন ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার রাত, ঘন জঙ্গলের পাশে নিঝুম নিরালা জনহীন পথে বাসের ভেতর সবাইকার ভয় করছে। ঠাকুমা হার্টের রোগী, খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। বাবা কাকাবাবু সুধীরকাকা সঙ্গে ছিলেন, ওঁদের কোনও ভয় নেই। জঙ্গলের আশেপাশে যে সব জনবসতি আছে সেখান থেকে খুঁজে পেতে কয়েকটা গোরুরগাড়ি জোগাড় করে আনলেন। গাড়ি ঠুকঠুক করে চলতে লাগল। গাড়োয়ানভাই গোরুগুলোকে প্রচণ্ডভাবে মারে আর মুখে একটা অদ্ভুত গলায় শব্দ করে ওদের বকতে থাকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তাদের ধীরগতি দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত হয় না। শেষ অবধি আমরা মেলায় এসে পৌঁছলাম। তখন সকাল আটটা। প্রথমে মায়েরা আমাদের নদীতে চান করিয়ে গা মুছিয়ে পাড়ে তুলে দিয়ে নিজেরা চান করে এসে আমাদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন। আমরা এবার মেলা থেকে পাঁপড় বেগুনি জিলিপি ইত্যাদি কিনে খাব। যখন খাওয়ার আয়োজন করছি দূরে দেখতে পেলাম বাবা কাকাবাবুরা দুটো ভাঙা মালসার টুকরো দিয়ে নদীর বালি থেকে কী-সব তুলে নিচ্ছেন। খালি কেরোসিনের টিনে তোলা হলে সেগুলি কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে বড় গর্তে ঢালছেন। ঢালা হয়ে গেলে সেগুলি বালি দিয়ে ভরে দিচ্ছেন। অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করছি, "মা, বাবারা কী করছেন?" মায়ের কথা শুনে বুঝলাম মেলায় বহু মানুষের সমাগম হয়েছে, তারা বর্জ্যপদার্থ পরিত্যাগ করে নদীতীরকে দূষিত করে তুলেছে, এর ফলে মহামারিও

ঘটে যেতে পারে। বাবা কাকাবাবুরা নদীতীরকে নির্মল ও দূষণমুক্ত করে তুলবেন এই স্থির করেই এখানে এসেছেন। নির্বিকার চিত্তে তাঁরা তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসায় আনন্দের ঝলক তাঁদের চোখেমুখে, ঘৃণার লেশমাত্র নেই। দৃঢ়চিত্ত মানুষগুলি কোনও কুণ্ঠা ও লোকলজ্জার ধার ধারেন না। জয়দেব পদ্মাবতীর কাহিনি নিয়ে কথকতা। মন্দিরের সুসজ্জিত মূর্তি, বাউলদের গান, বহুজনের একসঙ্গে বসে পঙ্‌ক্তিভোজন, মেলায় ঘুরে বেড়াবার মজা, সব ছাপিয়ে আমরা বাবা-কাকাবাবুদের মানুষের সেবায় উজাড় করে দেওয়া নিবেদিতপ্রাণ ছবিটি মনের মণিকোঠায় অম্লান হয়ে রইল চিরদিনের জন্য।

ভাই পাওয়ার ভাগ্য

আমাদের ভাইয়ের জন্মের সময়ের ছবি এখনও চোখে ভাসে। দাদু ঠাকুমাকে বলতেন, "তোমার ওই অদ্ভুত ছেলের যদি আবার মেয়ে হয় তবে ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।" পুরো বাড়িতেই দাদা ছাড়া সবাই আমরা মেয়ে। মা যখন সেবার আঁতুড়ঘরে সন্তান প্রসব করলেন, তখন দাই-মা বলে দিল, "তোমাদের যা হয় তাই হয়েছে।" ঠাকুমা স্টোভে জল গরম করছিলেন। দাইমার ঘোষণা কানে যাওয়া মাত্র তিনি এক লাথি মারলেন। গরম জলের হাঁড়ি কাত হয়ে পড়ে স্টোভ নিভে গেল ধোঁয়ায় আর কেরোসিনের গন্ধে সারা হলটা ভরে গেল। ঠাকুমা শোকার্ত গলায় কেঁদে যেতে লাগলেন, "ওরে আমার হাঁসুর কী হবে রে, ওর বাবা যে ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবে। ওকে ছেড়ে আমি কী করে বাঁচব?" কাঁদতে কাঁদতে খাটে গিয়ে শুলেন। তখনও বলে চলেছেন, "মা দুর্গা, তুমি কী সর্বনাশ করলে। মেয়ের বদলে একটা ছেলে দিলে কী হত?" ততক্ষণে জ্বর এসে গিয়েছে, কাঁপুনি হচ্ছে তাঁর। বড়মা বেশ কয়েকটা লেপ কম্বল চাপিয়ে দিল। পাশের বাড়িতে থাকে আমার বউদি, আঁতুড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলে না মেয়ে এইটুকু জানার জন্য প্রচেষ্টা করে যেতে লাগল। দাইমা এক রকম বাধ্য হয়েই শিশুটিকে ওকে দেখাল। বউদি ছুটে এসে বলল, "ও ঠাকুমা, তোমার নাতি হয়েছে, বেটাছেলে হয়েছে গো।" ঠাকুমা কাঁপা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "দেখ অনিলা (বউদির নাম অনিলা) আমার এখন কী হচ্ছে তার ঠিক নেই। তুই এই সময়ে রসিকতা করিস না।" এই সমস্ত সময়টা আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে হলের জানালার শিক ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে যাচ্ছি। দাদু আমার বাবাকে তাড়িয়ে দেবে ভাবছি আর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বাবাই যদি না থাকে আমরাই বা বাড়িতে থাকব কী করে? বউদি কাকুনিমিনতি করছে একবার শিশুটিকে দেখে আসার

জন্য। ক্রন্দনরতা ঠাকুমা ধরা গলায় বললেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আর তোর প্রাণে কি দয়ামায়াও নেই?" শেষে বউদি বড়মাকে টেনে নিয়ে গেল আঁতুড়ঘরের দরজায়। বড়মা ফিরে এসে ঘোষণা করল, "দুঃখের প্রতীক বিটিছেলে নয় বেটাছেলেই হয়েছে।" ঠাকুমা লেপকাঁথা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে স্টোভ ধরিয়ে জলের হাঁড়ি ঠিক করে বসালেন। জ্বর-কাঁপুনি সব কোথায় চলে গেল। আমাদের বললেন, "যা, কর্তাকে কাছারিতে খবর দিয়ে আয়। কোথায় মৌচাক আছে ভেঙে টাটকা মধু নিয়ে আয়। খোকনের মুখে দিতে হবে।" ময়রার দোকানে লোক পাঠালেন বড় বালতি ভরে রসগোল্লা আনতে। "সন্ধেবেলা দুর্গাঘরে পুজো দিয়ে পাড়ার সকলের ঘরে বিলোতে হবে।" চোখের জল মুছে ছুটলাম কাছারি, দাদুকে খবর দিতে, যেখানে দাদু বার লাইব্রেরিতে তাস খেলছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বললাম, "আমাদের ভাই হয়েছে।" দাদুর তাসখেলার সঙ্গীরা সহাস্যে বললেন, "আনন্দ সংবাদ, মিঠাই বিলোও। এখুনি আমরা মিষ্টি খাব।" দাদু উত্তর দিলেন, "মিষ্টি একটু নয়, যে যত খেতে পারো তত খাওয়াব।" আমরা বোকার দল আনন্দে নাচছি, একটুও তখন ভেবে দেখিনি, মেয়ে হয়ে জন্মে আমরা অকল্যাণ কিছু ডেকে আনিনি।

অসুখ

ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি ছোটবেলায়। জ্বরে ঝিমিয়ে থাকতাম। জ্বর ছাড়ার পরও শরীর দুর্বল বলে বিছানায় বন্দি থাকতে হত ক'দিন। জানালার ধারে বসে থাকি। জানালার নীচে পথ, পথ দিয়ে যারা যায় তাদের সকলকে ডেকে গল্প করি। যখন বসে থাকতে ভালো লাগে না, তখন শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে ছাতের নীচে কড়ি বরগার আলকাতরার কালো রং আর দেয়ালের চুনকাম করা সাদার মধ্যে কত যে ছবি আবিষ্কার করি! সেই ছবিগুলো নিয়ে নিজের মনে খেলা করি। কেউ বুড়ো, কেউ তার বউ, তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউ নাচছে, কেউ বা ২-৪ জন মিলে ঝগড়া-মারামারি করছে। তাদের নানা জনের নানান পরিচয় নিয়ে গল্প নিয়ে আমার সময় কেটে যায়।

এমনিভাবে আমার ছেলেবেলার দিনগুলি কেটে গেছে। পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয় সবই যেন ভালো ছিল, আনন্দের ছিল। মন্দ কি আর ছিল না? তবে সে সব এখন মনে পড়ে না।

শান্তিনিকেতন: স্মৃতির সম্পদ

বোলপুরের প্রথম ছাত্রী

আমার ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যেতাম, মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম চারদিকে। পুরোনো বোলপুরের রক্ষণশীল গ্রামীণ-সমাজের এক মেয়ে তার অচেনা অন্য ভুবন দেখে আবিষ্ট হয়ে থাকত। বাবা প্রথমেই যেতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে, তিনি তখন থাকতেন বেণুকুঞ্জে। অতি সাদাসিধে ধরন তাঁর জীবনযাপনে, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য যেন তাঁর সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত। মনে হত বেদ উপনিষদ-আদি সংস্কৃত শাস্ত্রাবলি তাঁর মননে সমৃদ্ধ হয়েছে। লাইব্রেরিতে কত বই, কতজন বই নাড়াচাড়া করছেন, নিজের চাহিদার বই পেলে ধীরে সেটি তাক থেকে নামিয়ে গ্রন্থাগারিক প্রভাতদার (মুখোপাধ্যায়) কাছে লিখে নিয়ে যাচ্ছেন। নিঃশব্দ পরিবেশ। বই পড়তে ভালোবাসি, তাই বড় লোভ হত আনন্দময় এই জীবনটির একটু অংশ পাওয়ার। বোলপুরে মেয়েদের যেটুকু পড়ার অধিকার ছিল সেই ধাপ পার হয়ে দু'বছর বাবার সঙ্গে বোলপুর হাইস্কুলে গেলাম। পঞ্চম শ্রেণিতে মেয়েদের পড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। বাবা বললেন, "শান্তিনিকেতনে পড়বি?" আনন্দে চোখে

জল এল। নিজের সৌভাগ্যে আপ্লুত আমি শৈশবের স্বপ্নপুরীতে যাওয়ার ক্ষণটির অপেক্ষায় রইলাম।

পাঠভবনের অধ্যক্ষ তখন ধীরেন্দ্রমোহন সেন। বীরভূমের প্রথম মেয়ের পাঠভবনে যোগদানকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন যে এখানে পড়ার জন্যে আমার কোনও বেতন লাগবে না। প্রথম দিন বৈতালিকের পর ক্লাসের মেয়েরা আলাপ-পরিচয়ে আমাকে আপন করে নিল। কয়েকজন অবাঙালি মেয়ে ঝরঝর করে বাংলা বলছে দেখে খুব ভালো লেগেছিল আমার। ঊষা মাঙ্গলিক, কমলা কৃষ্ণান, দেবী বলে একটি গুজরাতি মেয়ে, ওরা সকলেই যেন বাঙালি মেয়ে। সবচেয়ে ভাব হল সুজাতার সঙ্গে। পরে জেনেছিলাম ও আমার অনেক দিনের চেনা শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষের মেয়ে; আর মামার বাড়ি সুরুলে আমার জন্ম হয়েছে ওরই মায়ের হাতে।

শিক্ষা ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে

প্রথম দিনের ক্লাস তেজেশদার কাছে। ধীরেনদা 'শিশু' পড়াতেন সকালের বাংলা ক্লাসে, আর বিকেলে ইংরেজি ক্লাসে তারই অনুবাদ 'ক্রিসেন্ট মুন' থেকে পড়াতেন। আরিয়মদাও ইংরেজি পড়াতেন। এত সহজ করে পড়াতেন, মনেই হত না কোনও বিদেশি ভাষা পড়ছি। প্রথম বেড়াতে যাওয়া আরিয়মদার সঙ্গে চিপ সাহেবের কুঠি। শিশু বিভাগের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আমরা সারা পথ গল্প শুনতে শুনতে হাঁটলাম, যাওযা-আসার এতখানি পথ এইটুকু দূরত্ব মনে হল। নীল চাষ, নীলকুঠি, নীল ভেজাবার বড় বড় চৌবাচ্চা— সবই দেখালেন, সেইসঙ্গে বললেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিদেশি বণিকদের অত্যাচারের কথা, দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে নিজেদের অর্থলালসা চরিতার্থ করার কথা। ফেরার পথে শ্রীনিকেতনে এসে তারকদার বাড়িতে মুড়ি খাওয়া হয়েছিল মনে আছে।

তেজেশদার কাছে প্রকৃতি-পরিচয়ের ক্লাস করতে সবচেয়ে মজা লাগত। পুরো আশ্রম ঘুরে উনি আমাদের গাছ, লতা, ঘাস চেনাতেন। পরে একদিন কতকগুলো নাম লিখে দিতেন, সেই দেখে দেখে আমরা খুঁজেপেতে সব নিয়ে আসতাম। দেখতে দেখতে একদিন আশ্রমের সব গাছ আমাদের চেনা হয়ে গেল; আমাদের আপন হয়ে গেল। তার পর এল গুটিপোকা আর প্রজাপতি জানার খেলা। কাগজের বাক্সে ফুটো করে গুটিপোকা রাখা হত, যে গাছের গুটিপোকা, তার পাতাই তাদের খাদ্য। প্রতিদিন পাতা জোগানো হত। গুটি বাঁধার পর বারে বারে খুলে দেখতাম কখন প্রজাপতি বার হবে। প্রতিটি গুটির আলাদা রং আলাদা রূপ। আর প্রজাপতি যে দিন জন্ম নিল, সে দিন কী আনন্দ! তাদের ছেড়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে উড়ে যাওয়ার মজা দেখে মন ভরে

যেত। প্রকৃতি-পরিচয় ক্লাসের বাইরে আবার কুল-কামরাঙা-আম-জাম-পেয়ারা কোথায় কী হয়েছে সেগুলির সন্ধান করে আশ মেটানোও চলত। তেজেশদার কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম— সেই প্রকৃতিকে ভালোবাসা জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় কতবার যে ওষধির কাজ করেছে। মনে পড়ে ধীরেনদার (ধীরেন্দ্রমোহন সেন) পড়ানো। ইংরেজি ক্লাসে ভেনিস সম্বন্ধে একটি গদ্যাংশ পড়াতে গিয়ে ভেনিসের কত যে ছবি এনে দেখিয়েছিলেন। একটি গদ্যাংশে ছিল পেস্ট্রির কথা। আমরা কেউ পেস্ট্রির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না, ধীরেনদা আমাদের জন্য অনেক পেস্ট্রি কিনে এনেছিলেন, পেস্ট্রি খাওয়ার সেই আনন্দ ভোলার নয়।

মিলেছে একমন

পাঠভবনের মেয়ে হলেও পাঠভবনের শিক্ষক ছাড়াও অন্যদের সঙ্গেও আমরা ভাব জমিয়ে নিতাম। শৈলজাদার কাছে কোনও দিন ক্লাস করিনি, না জানি রসায়ন না জানি গান, অথচ উনি আমাদের সকলকে চিনতেন। আমার নাম দিয়েছিলেন 'বোলপুরী', দূর থেকে উচ্চকণ্ঠে 'বোলপুরী' বলে ডাক শুনলেই মনে হত তিনি আমাকে কত আদর করছেন। অনিলদা (চন্দ) কলেজের অধ্যাপক, তাঁর সাদা ধপধপে খদ্দরের পোশাক আর মুখে চুরুট। দূর থেকে দেখলেই ছুটে গিয়ে বলতাম, "অনিলদা, স্ট্যাম্প"। দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট পাই বা না পাই, আবদার করতে বাধা কোথায়! শান্তিনিকেতনের সব মানুষই যে আমাদের আত্মজন।

তখনকার লাইব্রেরির উপরতলায় ছিল বিদ্যাভবন। সেখানেও পা টিপে টিপে যেতাম, দেখতাম জ্ঞানতপস্বীদের তপস্যা চলছে। কোনওখানে আশ্রমের ঠাকুরদা ক্ষিতিমোহন সেন, কোনওখানে আবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলাভবন শ্রীভবনের (এখনকার শ্রীসদন) পাশে হওয়ায় শিল্পীদের বেশি দেখতে পেতাম। তখন খাবারঘর রান্নাঘর আশ্রমে একটাই ছিল। নানা বিভাগের অধ্যাপকরা কেউ আমাদের দেখে হাসতেন, কথাও বলতেন কেউ কেউ, তবে কিঙ্করদার (রামকিঙ্কর বেজ) মতো অত হৃদ্যতা আর কারও সঙ্গে ছিল না। যখন যে কাজে ব্যস্ত থাকুন, যেখানেই দেখা হোক একরাশ হাসি নিয়ে দরাজ গলায় কথা বলতেন। কলাভবনের ইন্দুদি চিত্রনিভাদি শ্রীভবনে থাকতেন। ইন্দুদির শান্ত স্নিগ্ধ রূপ, ধীর কণ্ঠস্বর, মধুর সুরের গান কোনও দিনও ভোলার নয়। পরে যখন জেনেছিলাম তিনি দেশের জন্য কাজ করে জেলও খেটেছেন, তখন মনে হতো এত যাঁর গুণ, তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি— আমাদের কী ভাগ্য। চিত্রনিভাদি আমাদের মায়েদের মতো সাদাসিধে কাপড় পরতেন। তাঁর আঁকা ছবি কী ভালোই যে লাগত। তাঁর স্নেহ পেতাম আমরা, ছোটরা। অন্য প্রদেশের

অনেক অবাঙালি মেয়েই শ্রীভবনে থাকতেন। থাকতেন হৈমন্তীদির মতো বিদেশিনি কর্ণধার। হৈমন্তীদি, মিস বোসনেক, সেলিনাদি সবাই যেন আমাদের ভালোবাসায়, শাসনে, সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে চাইতেন। আমাদের অধ্যাপক কন্যারাও আমাদের একান্ত আপন ছিলেন। তনয়দার মেয়ে নিবেদিতাদি আমাদের খেলার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। আর সুজাতা হাসুদি মমতাদি মোহরদি অনু রেণুকা টুলটুলদি সবাই তো ছিল বন্ধু। আজও তাদের জন্য মন কেমন করার সীমা নেই। বৈতালিকে যখন সমস্ত ভবনের ছেলে-মেয়েরা একাধিক শৃঙ্খলাবদ্ধ পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াতেন সে এক দেখার মতো দৃশ্য হত। সমস্ত আশ্রমবাসী যেন মৌন হয়ে মিলিত হতেন সেই বৈতালিকের আসরে। সেই প্রভাতকালে সম্মিলিত সংগীতের তানে সকলের মনের তানও যেন এক হয়ে মিলত।

সাহিত্যসভা

আমাদের সাহিত্যসভা তখন বসত বুধবার। শিশু বিভাগ, মধ্য বিভাগ, আদ্য বিভাগ— এইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসত।

একটি সভা হয়ে গেলে আগামীর জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। কেউ গান গাইত, কেউ লিখত, এবং সেই লেখা পাঠ করত, আর কেউ বা আবৃত্তি করত। প্রথম যখন যাই শিশিরদা আমাদের সাহিত্যসভার জন্য তৈরি করে দিতেন। দুপুরবেলা আমরা ওঁর ঘরে গিয়ে জড়ো হতাম। তার পর যেভাবে সভা হবে, সেইভাবে পরপর আমরা রিহার্সাল দিতাম। আবৃত্তি করার পর উনি হয়তো বলতেন, 'এখানে একটু অন্য রকম করলে ভালো শোনায় না?' লেখা শুনে কোথাও হয়তো সামান্য একটু বদলে দিতেন, ভুল থাকলে শুধরে দিতেন। বিচিত্র বিষয় হত লেখাগুলির। কেউ হয়তো পিকনিক বা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা নিজের মতো করে লিখত। নিজে বানিয়ে যা-খুশি গল্পও লিখত কেউ। একটি কাঠবিড়ালি শিশু বা আশ্রমের গাছে কোনও নতুন-ফোটা-ফুল নিয়ে ছোট্ট কবিতাও কেউ লিখত। কবিতা আবৃত্তি করতাম— আবোল-তাবোলের মজার কবিতা, সত্যেন দত্তের নানা ছন্দের কবিতা আর গুরুদেবের 'শিশু' কিংবা 'শিশু-ভোলানাথ' কিংবা 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা। গান সবই গুরুদেবের গান হত।

সভার সভাপতি কে হবেন সেও নিজেরা ঠিক করতাম। সভার কয়েক দিন আগে, যিনি সভাপতি হবেন, তাঁকে সভার তারিখ ও সময় বলে নিয়ে অনুরোধ করতাম সভাপতি হওয়ার জন্য। সভার দিন সকাল থেকে শুরু হত আমাদের অভিযান। উত্তরায়ণ, মালঞ্চ, নিচু বাংলা কিংবা খোয়াই— কোথায় ফুটেছে পলাশ কিংবা কাঞ্চন,

কোথায় গন্ধফুল— জুই গন্ধরাজ বা কেয়া, সারা সকাল ধরে সে সব খুঁজে তুলে এনে জড়ো করা হত। তার পর দুপুরে সভা সুন্দর করে সাজাবার জন্য বড় মেয়েদের কাছ থেকে নানা রঙের শাড়ি চেয়ে নিয়ে সভা সাজাতে যেতাম। কখনও সভা বসত ঘণ্টাতলায়, কখনও লাইব্রেরির বারান্দায়, কখনও বা গৌর প্রাঙ্গণে। সভার জন্য যে যেমন কাজ পারতাম, করতাম। কেউ মালা গাঁথতাম, কেউ আলপনা দিতাম। সম্পাদক বা সম্পাদিকা যে থাকত তার কথা মতো কাজ করে যেতাম। প্রতিবার মনে হত আমাদের এ বারের সভা যেন সবচেয়ে সুন্দর হয়।

সভা শুরু হলে যখন সভাপতি মশাই আসতেন, তাঁকে সাদরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে মালা-চন্দনে বরণ করতাম, তার পর গান শুরু হত। সভাপতি মশাই একের পর এক নাম ডাকতেন। নিজের নামটা এলেই বুক দুরুদুরু শুরু হয়ে যেত। মনে হত— 'ভালো হবে কি না কে জানে! আমার জন্য আমার সভার নাম খারাপ হবে না তো?' একবার সত্যেন দত্তর 'মেথর' কবিতা আবৃত্তি করবার পর, সকলে আমাকে দেখলেই 'মেথর মেথর' বলে চেঁচিয়ে উঠত। আমার বেশ মজাই লাগত নতুন নামটি নিয়ে।

মধ্য বিভাগে ওঠার পর আমাদের সাহিত্যসভার ভার নিলেন তনয়দা। তনয়দা বলতেন, "শুধু আবৃত্তি ভালো হলেই চলবে না, ঝরঝরে মুখস্থ হতে হবে। লেখাটা শুধু ভালো হলেই চলবে না, সুন্দর করে পড়তে হবে। মিষ্টি গলায় গান গাইলেও কথা ভুল হলে চলবে না। সুর ও কথা দুই সমানভাবে জানতে হবে।" তনয়দা আমাদের খুব ভালো করে তৈরি না করে ছাড়তেন না। এক সভায় 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করতে গিয়ে মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও এক লাইন ভুলে গেলাম। আসলে তনয়দার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের চোটে আরও ভুলে যেতে লাগলাম। পরে কী বকুনিইটাই না খেয়েছিলাম সেবার।

আরও পরে কাননদার উপর ভার পড়ল আমাদের মধ্য বিভাগের সাহিত্যসভার। উনি কী ক্লাসে কী ক্লাসের বাইরে, সব সময় আমাদের লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। প্রায়ই নানা নতুন বিষয়ে লিখতে বলতেন। আমরা যারা কোনও দিন লিখতাম না, তাদের দিয়েও তিনি লিখিয়ে নিতেন। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওঁর কাছে লেখা জমা না দিয়ে আমাদের উপায় থাকত না। নানা বিষয়ে লিখতে বলতেন। যে লেখাটা ভালো লাগত, সেটা সাহিত্যসভায় পড়তে বলতেন। একদিন বললেন সন্ধ্যামেঘের রং নিয়ে কিছু লিখে আনতে; আবার একদিন বললেন জ্যোৎস্নারাতে চড়ুইভাতি করতে যাওয়ার আনন্দ নিয়ে লিখতে। এ রকমই একবার বিষয় দিয়েছিলেন— 'যদি চিরকাল ছোট্ট থাকতাম'। ছোট্ট থাকাটা মোটেই পছন্দ ছিল না, সে কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছিলাম। লেখাটা ওঁর ভালো লাগায় কোনও এক সভায় পড়েছিলাম।

মহাশ্বেতা নোবেল প্রাইজ নিয়ে একটা সুন্দর তথ্যপূর্ণ লেখা লিখেছিল। যে সভায় পড়া হয়েছিল সেখানে ওকে সবাই খুব সাধুবাদ করেছিলেন। ভবিষ্যতে বড় লেখিকা হবার কুঁড়ি কি সে দিনই ধরেছিল? আজ ও নিজেই যদি কোনওদিন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যায়, তা হলেও অবাক হব না। এক সভায় মোহর পড়েছিল, 'জীবনে কী হতে চাই'— এই নামে সুন্দর একটি লেখা। তাতে ও চেয়েছিল— হীরাবাই বরোদকারের মতো উঁচুদরের গাইয়ে হতে আর গান শুনিয়ে বহু মানুষকে আনন্দ দিতে। সে দিনের সেই আনন্দদানের ইচ্ছাকে ও ওর জীবনে সার্থক করতে পেরেছিল। আমাদের মতো সাধারণ যারা, তারা সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শিখেছি 'সাহিত্যসভা' অনুষ্ঠান করা থেকে।

খেলাধুলা

খেলার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা পুকুর কাটানো হল। আমাদের সাঁতার শেখানোর তোড়জোড়ও শুরু হল। চুল যাতে না ভিজে যায়, তাই প্রত্যেকের জন্যে ক্যাপ আনিয়ে দিলেন ধীরেনদা। তিনিই সাঁতার শেখালেন আমাদের। বিকেলবেলা খেলার মাঠের সময়ই সাঁতার শিখে নিলাম আমরা। আজও সে শিক্ষা ভুলিনি। খেলার মাঠে কত যে খেলার আয়োজন ছিল। ভলিবল খেলতাম আমরা, খেলতাম বাস্কেটবলও। ছোরাখেলাও শেখানো হয়েছিল আমাদের। খেলার মাঠের দায়িত্বে ছিলেন বেবিদি (নিবেদিতা ঘোষ)। খুব ভয় পেতাম তাঁকে।

মন-খারাপের স্মৃতি

রান্নাঘরের কাজ যারা করতেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল প্রভাকর। একদিন আমাকে দেখে বললেন, "তুমি কি আমার দাসীদিদিদের বাড়ির মেয়ে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, উনি আমার কাকিমা।" তখন আমার সঙ্গীসাথীদের মধ্যে কেউ কেউ ছি ছি করে উঠল, বলল, "এ মা, রান্নাঘরের চাকর তোর আত্মীয় হয়?" আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনও মানুষকেই ছোট ভাবতে তো শিখিনি। শান্তিনিকেতনের অনেক আনন্দের স্মৃতির মধ্যে এই কালো ছায়াটুকু থেকে গেছে আজও। এ রকম দুঃখ পাওয়ার স্মৃতি আরও আছে। পৌষপার্বণের দিন বাড়ির জন্য মন কেমন করছে খুব। রান্নাঘরে পিঠে-গড়া চলছে সবাই মিলে। বড়দের মধ্যে কেউ একজন বলছেন শুনতে পেলাম, "কল্যাণী খুব ছোট জাতের মেয়ে, ওদের বাড়ি অবশ্য শিক্ষিত।" শুনেই কান্না এসে গেল আমার। কাঁদতে কাঁদতে একাই বাড়ির দিকে ছুট। খুব ভয় করছিল

একা একা হাঁটতে, তবু হস্টেলে ফিরতে পারিনি তখন। পরের দিন কাকা এসে হস্টেলে পৌঁছে দিলেন। না-বলে চলে যাওয়ার জন্য ধীরেনদার কাছে বকুনি খেলাম।

শ্রীভবন

শ্রীভবনের মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভাব হল সেবা মাইতির সঙ্গে। খুব ভালো নাচত ও। সেবা এক ক্লাস নীচে পড়ত। রেবা আমার সঙ্গেই পড়ত। ওর সঙ্গেও ভাব হল খুব। দুজনেরই বাড়ির জন্য মন কেমন করত। এক বছর পরে রেবা চলে যায়। ক্লাস টেনের মেয়েরা আমাদের গল্প বলতেন। এঁদের মধ্যে আয়েষাদির কাছে গল্প শোনা খুব মনে পড়ে। আয়েষাদি পরে জয়পুরের রানি হয়েছিলেন (গায়ত্রী দেবী)। অনেক বছর পরে জয়পুরে সপরিবার বেড়াতে গিয়ে গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুরোনো দিনের গল্প হয়েছিল দুজনে মিলে। বর্মা থেকে এসেছিলেন চার বোন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন বর্মার হাতপাখা, বর্মার চটি। ইন্দিরা গান্ধীও সে সময় কয়েক মাস ছিলেন শ্রীভবনে। তাঁকে দেখে মনে হত যেন রজনীগন্ধার ডাঁটি। ইন্দিরাকে দেখার আগের দিনই দেখেছিলাম তাঁর মা-বাবাকে। বোলপুরের জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কমলা নেহরুর গলায় মালা পরিয়েছিলাম আমিই। খুব ভালো লেগেছিল তাঁকে।

গান্ধী-পুণ্যাহ

শান্তিনিকেতনের নানান অনুষ্ঠান এখন সকলেরই জানা। যে অনুষ্ঠানটি বাইরের লোকেদের গোচরে আসে না, তার নাম গান্ধী-পুণ্যাহ। ১৯১৫-তে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসার পর গান্ধীজি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে শান্তিনিকেতনে এক মাস ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আশ্রমের যা কিছু কাজ, সবই ছাত্র-ছাত্রীরাই করবে। তাঁর ইচ্ছামতন শুরু হয়েছিল সেভাবে কাজ করা। কিন্তু কয়েক দিন পরে শিক্ষা-সূচির সঙ্গে কাজ করার তাল মেলাতে না পারায়, কাজ-করা ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে যায়। কেবল গান্ধীজির সম্মানার্থে, তাঁর স্মৃতিতে বছরে একটি দিন আশ্রমের পরিচারকদের ছুটি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা সব কাজ করে তার পর থেকে। গান্ধীজি প্রথম এসেছিলেন ১০ মার্চ তারিখে। সেই তারিখটিতেই গান্ধী-পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১০ মার্চের আগে একটা সভা করে প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেওয়া হত। এ রকম একটি সভায় যখন শ্রীভবনের শৌচাগার কে পরিষ্কার করবে, এই প্রশ্ন উঠল, তখন কেউই আর ওঠে না। আমার মনে হল, কেন আমি পারব না, আমাকে পারতেই হবে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি করব।" সভাপতি ছিলেন ধীরেনদা, খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, "এই তো, এ কাজে এগিয়ে এল একজন। আর কেউ কি ওর

সঙ্গে থাকবে?" তখন আমার বন্ধু মহাশ্বেতা উঠে দাঁড়াল। এই কাজ আমরা খুব ভালোভাবেই করেছিলাম। সত্যেন দত্তের কবিতা আবৃত্তি করে 'মেথর' নাম তো আগেই হয়েছিল, এরপর ছেলেরা ডাকতে লাগল 'মেথরানি' বলে।

নন্দলাল বসু

এই সূত্রে মনে পড়ে এক মহাপ্রাণ মানুষকে, যাঁর নাম নন্দলাল বসু। তাঁকে সকলে ডাকত 'মাস্টারমশাই' বলে। গান্ধী-পুণ্যাহ তিথিতে মাস্টারমশাই তাঁর কলাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে ঝাঁটা আর ময়লা তোলার পাত্র নিয়ে সব জঞ্জাল মুক্ত করে সমস্ত আশ্রম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতেন। তখন আশ্রমের অনেক বাড়িতে খাটা-পায়খানা ছিল, সে সবও তাঁরা নির্মল করে নিতেন। 'ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে'— তাঁদের কাজে এ কথাই যেন সত্য হয়ে উঠত। তিনি গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসে নিজে শিল্পগুরু হয়ে উঠেছিলেন। সকল উৎসবসজ্জার দায়িত্ব ছিল তাঁর। তাঁর ছাত্রদের নিয়ে আম্রকুঞ্জের আঙিনা আলপনায় শ্রীমণ্ডিত করে তুলতেন। সিংহসদনে বা তখনকার লাইব্রেরির অঙ্গনে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান হলে তাও তিনি সুসজ্জিত করতেন। উৎসব-অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিত তাদের সকলের সাজানোর ভারও তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের উপরেই ছিল।

তাঁর সম্বন্ধে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এবার বলি। একবার পৌষমেলায় একটি অটোগ্রাফ খাতা কিনে তার প্রথম পাতায় গুরুদেবের স্বাক্ষর নেবার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। উত্তরায়ণে গিয়ে শুনলাম গুরুদেব উদীচিতে আছেন। সে দিকে গিয়ে দেখি দরজার কাছে আলুদা (সচ্চিদানন্দ রায়) পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। কঠিন মুখ করে বললেন, "গুরুদেবের সঙ্গে এখন দেখা হবে না"! আমি কাকুতিমিনতি করতে জানতে চাইলেন কী প্রয়োজন। গুরুদেবের স্বাক্ষর নিতে চাই শুনে বললেন, সঙ্গে টাকা আছে? আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "টাকা লাগে তা তো জানতাম না? আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।" শত অনুরোধে উপরোধেও তাঁকে রাজি করাতে পারলাম না। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে যেতে যেতে দেখি এন্ড্রুজ সাহেব উদয়নের বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে স্বাক্ষর চাইতে, তিনি আমাকে গুরুদেবের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লিখে তলায় নিজের নাম লিখে দিলেন। খুব ভালো লাগল তাঁর এই সহৃদয় ব্যবহার। তাঁকে প্রণাম করে আবার ফিরে গেলাম উদীচীর কাছে। সেই আলুদা তেমনি করেই দরজা আগলালেন। 'টাকা নিয়ে এসো তার পরে স্বাক্ষর পাবে'— এই তাঁর দাবি। কী আর করি, চাওয়া পূর্ণ হল না। তাই মন খারাপ নিয়ে ফিরে চললাম। কিছুটা পথ এসে মাস্টারমশাইয়ের

সম্মুখীন হলাম। উনি আমাকে দেখে বললেন, "মন খারাপ কেন, কী হয়েছে তোমার?" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি ভাবছি তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ, আমি শিশু বিভাগের একটি মেয়ে, আমার মনের বেদনা তাঁর চোখে কেমন করে ধরা পড়ল। কোনও দিন তাঁর সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয়নি, কত বড় হৃদয় হলে অচেনা মানুষের দুঃখ-ব্যথা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি এসে চামেলি-বিতানে বসলেন, খাতাটি আমার হাত থেকে নিয়ে আঁকতে লাগলেন। ওঁর কাছ ঘেঁষে আমি দেখছিলাম মুগ্ধ হয়ে— কেমন করে রূপ নিচ্ছে একটি ছবি— এক সাঁওতাল বুড়ি-মা তাঁর দাওয়ায় বসে তালপাতার চাটাই বুনছেন। এক সময় আলুদা এসে বললেন, "এ কী, আপনি ওঁকে ছবি এঁকে দিচ্ছেন? গান্ধীজি আগে থেকেই নিতেন, এখন গুরুদেবের স্বাক্ষর নিতে গেলেও টাকা লাগবে। আপনিও মাস্টারমশাই এ নিয়ম করুন।" মাস্টারমশাই বললেন, "গুরুদেব বা গান্ধীজির মতো বড় আমি নই, আমি সামান্য মানুষ। তাই এমন কোনও ইচ্ছা আমার নেই। এই ছোট মেয়েটির মন খারাপ করা আমাতে এখানে বসে একটা ছোট্ট ছবি আঁকিয়ে নিচ্ছে। ওর মুখে এক টুকরো হাসি দেখতে চাই। তুমি এখন এখান থেকে যাও।"

আমি ধন্য হয়ে গেলাম। গুরুদেবের ক্লাসে গিয়ে বসেছি, গুরুদেব নিজে আমাকে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন, এ সবই আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য ঠিকই। সেই সঙ্গে নন্দলাল বসুর মতো মানুষকে দেখেছি— এও তো আমার স্মৃতির ভাঁড়ারে কম মূল্যবান সম্পদ নয়।

গুরুদেব

একটা লম্বা ঘরে চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির মেয়েরা থাকত। ছোট মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য দু'তিনজন মহিলা থাকতেন। তাঁরা আমাদের খুব যত্ন করতেন। ভোরের ঘণ্টা পড়লে আমরা সবাই উঠে বাইরের বারান্দায় নিজের নিজের আসন নিয়ে চুপ করে বসতাম। টুপটুপ করে ফুল ঝরে পড়ত। নানান পাখির কণ্ঠস্বরে-সুরেলা থাকত পরিবেশ। মনে হত এক নীরব উপাসনা চলছে যেন। পরে যখন লাইন করে কিচেনের দিকে যেতাম, তার আগে প্রত্যেককে পঞ্চতিক্ত খেতে হত। সে যে কী তেতো তা বলার নয়। গুরুদেবের নির্দেশেই এই ব্যবস্থা ছিল। দু'বছর ধরে আমি যে ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তা একেবারে সেরে গেল।

বুধবার সকালের জলখাবার মুড়ি আর বোঁদে খেয়ে লাইন করে মন্দিরে যেতাম। গুরুদেব আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন। তাঁর বক্তব্য বোঝার ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না। তবু ভালো লাগারও যেন শেষ থাকত না।

শিশির মিত্রদা ভূগোল পড়াতেন। তিনি আমাদের সাহিত্যসভার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। যার যে দিকে প্রবণতা তাকে সেইভাবেই তৈরি করে দিতেন। আমাকে উনি বেছে নিলেন কবিতা আবৃত্তি করার জন্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা, শিশু এবং কথা ও কাহিনী-র কোনও না কোনও কবিতা শিশু বিভাগের সাহিত্যসভায় আমি নিয়মিত আবৃত্তি করতে লাগলাম।

এই রকম এক সাহিত্যসভায় প্রভাত গুপ্তদা সভাপতি ছিলেন। আমার কণ্ঠে জন্মকথা কবিতাটি তাঁর ভালো লেগেছিল। প্রভাতদা কলেজে পড়াতেন। একদিন উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, পরদিন বিকেলে আমাকে নিয়ে উত্তরায়ণে যাবেন। অবাক হয়ে বলি— কেন? উনি বললেন, গেলেই বুঝবে। উত্তরায়ণে যাওয়ার সময় প্রভাতদা বললেন, সিংহসদনে একটা বড় সভা হবে। বাইরে থেকে অনেকে আসবেন। সেখানে আমায় 'আষাঢ়' কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে। কীভাবে আবৃত্তি করতে হবে আজ গুরুদেব আমাকে শিখিয়ে দেবেন। সেইভাবে আমাকে তৈরি করতে হবে।

স্বয়ং গুরুদেব আমাকে আবৃত্তি করতে শেখাবেন এমন আশা স্বপ্নেও করিনি। গুরুদেব তখন শ্যামলীতে ছিলেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি বললেন, "তুমি আগে কবিতাটি পড়ে শোনাও।" আমার পড়া শেষ হলে গুরুদেব নিজে পড়লেন। বললেন, "লক্ষ করো কেমনভাবে আমি পড়ছি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি স্তবক সেইভাবে বলতে হবে।" তিন-চারবার আমি পড়ি আর উনি কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় গলা নামাতে হবে সব দেখিয়ে দিতে লাগলেন। শেষে গুরুদেব কবিতাটি আবার পড়লেন। পরে বললেন, "যখন তুমি আবৃত্তি করবে, কবিতাটি ছবি হয়ে যেন তোমার চোখের সামনে ভাসে। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সময় শব্দের চিত্ররূপ তোমার গলায় আনতে হবে।" তাঁর চরণে প্রণত হয়ে আমি তাঁর আশীর্বাদ চাইলাম। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। সিংহসদনে সেই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আশ্রমবাসী ছাড়াও বাইরে থেকে অনেক গুণীজন এসেছিলেন। আমার আবৃত্তি অনেক সাধুবাদ পেয়েছিল। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে গুরুদেবকে একান্তে কাছে পাওয়ার আনন্দ-অনুভব আমার সারা জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইল।

সেই সময় ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের শিল্প মেলার জন্য দু'-তিন দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। মা বোলপুর থেকে নিজেদের হাতের কাজসহ অনেক মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এই মেলায় যোগ দিতে আসতেন। মায়ের সঙ্গে আমিও মেলায় এসেছি। শান্তিনিকেতন থেকে প্রতিমা বৌঠান, লাবণ্য দেবী (চক্রবর্তী) প্রমুখ কয়েকজন এসেছিলেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় আমায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন গুরুদেবের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। অনেক দিন আগে বাবার কাছে শেখা 'শাজাহান'

কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। সভা শেষে বৌঠান আমায় ডেকে বললেন, আমার আবৃত্তি তাঁর ভালো লেগেছে। শ্রীভবনে ফিরে আমি যেন তাঁর সঙ্গে উত্তরায়ণে দেখা করি। উত্তরায়ণে বৌঠানের কাছে গেলে তিনি আমাকে আবার 'শাজাহান' আবৃত্তি করতে বললেন। আবৃত্তির শেষে তিনি আমায় কয়েকটা জায়গায় বদল করে দেখিয়ে দিলেন। তার পর ওই ভাবে আরও কয়েকবার আমাকে বলতে হল। অবশেষে যখন আমার আবৃত্তি তাঁর পছন্দ হল বললেন, আমি যেন বারে বারে আবৃত্তিটা অনুশীলন করি। তখনও জানি না তাঁর উদ্দেশ্য কী?

দু'তিন দিন পরে দেখি শ্রীভবনের বাইরের বসার ঘরটা পরিষ্কার করে সাজানো হচ্ছে। শুনলাম গুরুদেব আমাদের হস্টেল পরিদর্শন করতে আসবেন। আমরা অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। বৌঠান নিজে গাড়ি চালিয়ে গুরুদেবকে নিয়ে এলেন। হৈমন্তীদি, সুধাদি (মেট্রন) ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। বসার ঘরে বসে ছোট-বড় সকলকে গুরুদেব কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। একে একে লাইন করে সবাই তাঁকে প্রণাম করলাম। একটু পরে বৌঠান বাবামশাইকে বললেন, "বোলপুরের একটি ছোট মেয়ে এখানে আছে, যাকে একবার আপনি আবৃত্তি শিখিয়েছিলেন, সে আজ আপনাকে একটা আবৃত্তি শোনাবে।"

অভাবনীয় এই প্রস্তাব শুনে একটু ভয় ভয় করছিল। তবু মনে সাহস সঞ্চয় করে গুরুদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং শান্ত মনে 'শাজাহান' আবৃত্তি করলাম। আবৃত্তি শেষে তাঁর মুখের হাসি আমায় আশ্বস্ত করল। 'শাজাহান' কবিতার স্রষ্টাকে আমি মনে মনে 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' এই বলে আবার প্রণাম করলাম। শ্রীভবনে যারা গান করেন, সমবেত কণ্ঠে গুরুদেবের গান গেয়ে মাতিয়ে দিলেন। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান দিয়ে শেষ হল। বৌঠান গুরুদেবকে এবার উত্তরায়ণে নিয়ে যাবেন। বড়রা তাঁকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

এই দিনটি রবির আশিসে আমার জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জেগে রইল।

রবীন্দ্রনাথের গানের গভীরে

আমার বয়স তখন বছর পাঁচ-ছয় হবে, যখন প্রথম আমি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা শুনি— সুরে নয়, কথাতেই। ছোটকাকাবাবু শান্তিনিকেতনে বি.এ. পড়তেন। বোলপুর থেকে সকালে আসন বইখাতা নিয়ে সাইকেলে করে যেতেন। আর বিকেলে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। মজা করে বলতেন, "তোকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান লিখেছেন।" সবাই বলত, "সে কেমন গান?" আমার ডাক নাম বাদল। কাকাবাবু বলতেন যেমন, 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল', 'বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে একতারা', 'বাদল মেঘে মাদল বাজে', 'বাদলধারা হল সারা', আরও কত আছে। কাকাবাবু ভালো ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন। সুরতান তাঁর ছিল, তবু সুরে গেয়ে বলতেন না। পরে শিক্ষাগারে যখন নির্মলকাকা থাকতেন তখন প্রায়ই তিনি বিকেলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। সেখানে বসে তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন। তার একটি লাইন মনে আছে : 'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে। আমি চলব বাহিরে।'

৯ বছর যখন বয়স তখন জানি না কোন পুণ্যের ফলে শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, বীরভূমের প্রথম মেয়ে, ১৯৩৪ সালে। প্রথম বছর ভোরে গিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসতাম। সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন হাবুকাকা। কাছারিপট্টি থেকে মাঠের মধ্য

দিয়ে গিয়ে বোলপুর হাইস্কুল পার হয়ে তখন এক বড় শালবন ছিল। শালবনে পা দিয়েই হাবুকাকা গান ধরতেন, 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।' উদিত সূর্যের প্রথম আলোয় তাঁর উচ্চকণ্ঠের ভারী গলার সেই গান শালবন পার হয়ে মাঠেঘাটে ছড়িয়ে পড়ত। কী ভালোই যে লাগত আমার, যে দিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে বৈতালিকেও ওই গান শুনতাম।

শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে তখন গান ভেসে বেড়াত। ক্লাস করছি শিশু বিভাগের বারান্দায় বা ঘণ্টাতলায়। লাইব্রেরির বারান্দা থেকে গান কানে আসছে। মিশে যাচ্ছে পড়া আর গান একই হাওয়ায়। যে দিন বেড়াতে যাওয়া হত, খোয়াই পার হয়ে কোপাই নদী বেয়ে গোয়ালপাড়া গ্রামে গিয়ে আবার ফিরে আসা, তখন তো অবিরাম গানের ধারা বইত। অবিরল বৃষ্টি যদি তখন নামত আনন্দে ভিজতে ভিজতে যেন গানের সুরে আমাদের ভুবন ভরিয়ে দেওয়া হত।

তেজেশদার কাছে প্রকৃতি-পরিচয়ের শিক্ষায় শান্তিনিকেতনের প্রতিটি ফুল-লতা-বৃক্ষ-কীট-পতঙ্গ গুটিপোকা প্রজাপতি, পায়ের তলার ঘাস ও ধূলিও আমাদের আপন হয়ে উঠেছে, তেমনই প্রতিটি মানুষকেও আমরা চিনে নিয়েছি আত্মজন বলে। এমনি করে একদিন আমরা উপস্থিত হলাম গুরুদেবের গানের সভায়। নববর্ষ বর্ষামঙ্গল শারদোৎসব বসন্তোৎসব শ্যামা চণ্ডালিকা নটীর পূজা চিত্রাঙ্গদা এই সব অনুষ্ঠানে নাচগান আবৃত্তি অভিনয়ের যে মহড়া চলত তা আমাদের দেখা ও শোনা আবশ্যিক ছিল। আমরা শিশুর দল কিছু না বুঝলেও আমাদের শ্রবণ মনন ও চিন্তায় অন্তরের অন্তস্তলে যে গভীর অনুরণন চলত, তাই হয়তো তাঁর অভিপ্রেত ছিল।

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি আনন্দে ভরা ছিল। গুরুদেবের আনন্দের গানগুলি তাই খুব মন টানত। 'সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয় নির্মলপ্রাণে/জাগো প্রাতে আনন্দে করো কর্ম আনন্দে,/সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে।' 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।/তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ / ও তার অন্ত নাই গো নাই।' যে গানে ব্যথার ভেতর দিয়েও আনন্দ আসে তার সন্ধান পাই:

আনন্দগান উঠুক তবে আজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।।

কঠিন দুখে গভীর সুখে আমাদের অনুভবে সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করার অমৃত আমরা পেয়েছি তাঁর গানে, নিরন্তর যে অনন্ত আনন্দধারা বয়ে চলেছে ভুবন জুড়ে, প্রতিটি জীবন যেন তার পুণ্য পরশে ধন্য হয়ে ওঠে। তাই তাঁর আর্তি—

বসিয়া আছ কেন আপন মনে
স্বার্থনিমগন কী কারণে?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি।
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য-জীবনে।।

তাঁর গানের কথা, সুরের ভেতর দিয়ে নিখিলবিশ্বকে ভালোবাসতে শিখলাম। এমনকী বিশ্ববিধাতাকেও বলতে পারলাম:

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

একদিন শান্তিনিকেতনের দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আর ফেরা হল না। তখন সপ্তম শ্রেণির পড়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি মধ্য বিভাগের ছাত্রী। সাংসারিক অসুবিধার জন্য ছুটিতে বাড়ির পড়া শেষ করতে পারিনি, তার প্রতিবাদে আমার শিক্ষক বাবা আমার লেখাপড়াই শেষ করে দিলেন। বিধিবদ্ধ ক্লাসের পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও পাঠভবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আর গুরুদেবের কবিতা ও তাঁর সাহিত্য রইল আমার জন্য। দুঃখ রইল ছুটির আগে প্রতিমা বৌঠানের তত্ত্বাবধানে 'গান্ধারীর আবেদন'-এ গান্ধারীর ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মহড়া চলছিল, তা শেষ হল না। আনন্দময় পরিবেশ থেকেও বঞ্চিত হলাম।

দিন চলে যায়। বছরও শেষে হয়। নেমে এল দুর্যোগের রাত্রি। বাবা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন, ডাক্তার সন্দেহ করলেন যক্ষ্মা। তখন সে রোগের কোনও ওষুধ ছিল না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ভালো খাওয়া আর গভীর মমতায় সেবা-যত্ন, তার উপরেই নির্ভর করত রোগমুক্তি। বাড়ির যে ঘরে সবচেয়ে আলো-বাতাস খেলে সেই ঘরে বাবার থাকার ব্যবস্থা হল। আমি হলাম সেবিকা, মায়ের সে ঘরে ঢোকার অনুমতি মিলল না। সংক্রামক ব্যাধি। পাড়াপড়শি হিতৈষীর দল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনো যদি আসতেন সান্ত্বনা দেবার ছলে জনান্তিকে বলে যেতেন, শিবের অসাধ্য রোগ, এ রোগে কেউ তো বাঁচে না, দ্যাখ, সেবা করে যে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারিস! তখনও বয়স আমার কম, বুদ্ধিও পরিণত নয়, সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে হারাবার ভয় ও যন্ত্রণা আমাকে বেদনায় বিদ্ধ করেছে, নুইয়ে দিতে পারেনি। ঘড়ির কাঁটা ধবে

একটি বড় মানুষকে আপন শিশুর মতো পরিচর্যা করেছি কঠিন ব্রতের নিষ্ঠায়। একমাত্র সাথী ছিল একখানি গীতাঞ্জলি। গুনগুন করে মনে মনে গেয়েছি: 'নিঠুর হে এই করেছ ভালো। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।' এই রকম দুঃখ-জয়ের গানের কলিগুলি আপন মনের গহনে বেজে চলতে সব সময়ে। এমনি করে সময় কাটে, বছর ঘুরে যায়, বাবা ভালো হয়ে ওঠেন। কাজের মাঝে সময় করে পুরোনো পাঠ্যবইগুলি নিয়ে পড়তে বসি। এ কথা আমার বোন বর্ষার কাছে শুনে আবার আমাকে পড়া শুরু করতে বলে নবম শ্রেণির বই কিনে দেন বাবা।

বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ে তখন সুধাময়ীদেবী প্রধান শিক্ষিকা, পঞ্চম শ্রেণি অবধি পড়ানো হত। বাইরের কোনও ভালো স্কুল থেকে বাসন্তী অষ্টম শ্রেণিতে পড়তে এল। আমি নবম শ্রেণিতে পড়তে গেলাম। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সুধাদি আলাদা করে পড়াতেন। সুধাদিকে আমি ছোট থেকে দেখেছি। তিনি যে এত ভালো গান করেন তা আমি জানতাম না। সুধাদি আমাদের রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন। বোলপুরের মেয়েরা যে অমৃতরসের সন্ধান পায়নি তার আস্বাদ তারা পেল। আমার বোন বর্ষার সুন্দর জোরালো গলা ছিল। তাকে বাল্মীকির চরিত্র দিয়ে বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য করালেন। এই সময় বোলপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ভ্রান্তিময়ী দেবী (আমাদের মাসিমা) আমাদের গান শেখাতে চান। আমরা দুই বোন তাঁর কাছে গান শিখি। তিনি আমাদের রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন। 'জাগরণে যায় বিভাবরী' 'কদম্বেরি কানন ঘেরি' 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে' এই সব গান তাঁর কাছে শিখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে থাকতে আমি নুটুদির (রমা কর) কাছে গানের ক্লাস করেছি। শান্তিদির (শান্তিদেব ঘোষ) কাছেও গান শিখেছি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহর) আমার সঙ্গে পাঠভবনে পড়ত। ও আমার বোন বর্ষার গান শুনে ওকে গান শেখাতে চায়। দুই বোনে ওর কাছে যেতাম। বর্ষাই শিখত, আমি ওদের সঙ্গে গলা মেলাতাম। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' আর 'রোদনভরা এ বসন্ত'— এই গান দুটি মনে পড়ছে। অনেক গান ও শিখিয়েছিল। আজ আর কথাগুলি স্মরণে আসছে না।

পরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করে যখন কলেজে পড়তে গেলাম, আমার ঠাকুরদা হস্টেলে থাকা পছন্দ করলেন না। শান্তিনিকেতনে বাড়িভাড়া করে রইলাম। বর্ষা সংগীতভবনে গান শিখতে লাগল। নীলিমা সেন ওর সতীর্থ ছিল। কলেজে শৈলজাদার (শৈলজারঞ্জন মজুমদার) কাছে আমি গানের ক্লাস করেছি। 'ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল পিয়ালের বন/ কোনখানে আজ পাই এমন মনের মতো ঠাঁই/ যেথায় ফাগুন

ভরে দেব দিয়ে সকল মন/দিয়ে আমার সকল মন', 'এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে এস করো স্নান' 'এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে', এই সব ছাড়াও আরও অনেক গান শিখেছিলাম। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি গানের সুধায় ভরা ছিল। একটা মজার কথা, শালবীথিকায় যেখানে মল্লিকজি আমাদের ইংরেজি নাটকের ক্লাস নিতেন তখন কিছু দূরে একটি ঘরে (যেখানে তখন আমাদের গানের ক্লাস করতাম) শৈলজাদা রাজেশ্বরীদিকে (বাসুদেব, পরে দত্ত) গান শেখাতেন। আমাদের মন ওই বিদেশি নাটকের থেকে তখন রাজেশ্বরীদির সুমধুর কণ্ঠের গানের দিকেই চলে যেত।

একদিন কলেজের প্রথম বছরের শেষে গরমের ছুটির ভেতরে আমার ছাত্রীজীবন শেষ হয়ে গেল। বিদায়-বাঁশি উঠল বেজে। যেতে হল অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে। পরবর্তী বৃহত্তর জীবন নিয়ে এল কত সুখ কত দুঃখ কত ঘাত-প্রতিঘাত। কত আনন্দে ভরা মধুর দিনগুলি, কত ব্যথায় ঘেরা রোদন ভরা নিদ্রাহারা রাত পার হয়ে আজ এই জীবনের শেষ প্রান্তে এলাম। রবীন্দ্রনাথের গানের গভীরে অবগাহন আজও শেষ হয়নি। পথের শেষের প্রতীক্ষায় 'সমুখে শান্তি-পারাবার'-এর পানে চেয়ে আছি।

আমার শিল্পচেতনা

এখন ছোটরা কত আঁকে, নানা রকম হাতের কাজ করতে শেখে, আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ পাইনি। রং-তুলি কিংবা কালি-কলম দিয়ে ছবি আঁকতে আমরা জানতাম না। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, পৌষ মাস, ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে মায়েরা আলপনা দিতেন, তার সঙ্গে আমাদেরও ডাকতেন। আমরা ভালোমন্দ যে যেমন পারি নিজেদের সাধ্যমতো, ইচ্ছেমতো আলপনা দিয়ে উঠোন ভরিয়ে তুলতাম। সেঁজুতি-ব্রতে পিটুলিগোলা দিয়ে সোনামানিকের কত গয়না ঘরকন্নার কত শত আয়োজন এঁকে ব্রতের মন্ত্রে সে সব চেয়ে নিতাম। বাস্তবে হোক না হোক, কল্পনায় কিন্তু সব আশা পূর্ণ হয়ে যেত।

পুজোর আগে দুর্গাপ্রতিমা গড়তে আসতেন গৌর মিস্ত্রি আর বিষ্ণু মিস্ত্রি দুই কারিগর। বাবা-ছেলে দুজনে মিলে এক মাস ধরে কাজ করতেন। আমাদের কাজ ছিল তাঁদের চারপাশে ঘুরঘুর করা আর অবাক বিস্ময়ে তাঁদের কাজ দেখা। খড় দিয়ে কাঠামো গড়া, মাটিকে কতভাবে তৈরি করা— চালুনি দিয়ে ছাঁকা, কত যত্ন করে তাকে মাখা। পরে ঠাকুরের গায়ে একমাটি, দু'মাটি, তিনমাটি করা, খড়ি দেওয়া, অবশেষে রঙের কাজ। আমরা শিশুর দল, চারপাশে ছড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু কোনও কিছুতে হাত দেওয়ার অধিকার আমাদের ছিল না। বেশি গোলমাল করলে দারুণ

বকুনি খেতে হত। সবশেষে চালচিত্র আঁকা আর চক্ষুদান হত। আলো-ঝলমল সপ্তমীর সকালে সেই প্রতিমা ঘাম-তেল মেখে চুল এলিয়ে যখন জীবন্ত হয়ে উঠত, তখন কারিগরেরা প্রণাম করে মন্দির থেকে নীচে নেমে আসতেন। তখন সেই আশ্চর্য রূপ দেখে কেমন করে এমনটি সম্ভব হল ভেবে ভেবে কূলকিনারা পেতাম না। নিজেরা হাতে রং-তুলি পাইনি, কিন্তু তুলি দিয়ে নানা রঙের কাজ আমরা আরও দেখতে পেতাম যখন পটুয়ারা পট এনে দেখাতেন। দু'পাশে দুটো কঞ্চির টুকরো দেওয়া জড়ানো পট দেখিয়ে তাঁরা গান গাইতেন। হলুদ পটভূমিতে কালো লাল এই সব রং দিয়ে দেব-সভা পাপ-পুণ্যের বিচার, পৌরাণিক কাহিনি এই সব মূর্ত হয়ে উঠত। বিষয় যদিও পুরোনো, ছবির মানুষগুলি কিন্তু আমাদের চারপাশে যাদের দেখি তাদের মতোই থাকত। সেই সব পটের ছবি দেখে পটুয়ার গান শুনে মন আমাদের সেই ছবির জগতে ঘুরে বেড়াত। ছবির দেবতারা এবং মানুষেরা আমাদের অতি আপনার জন হয়ে বিরাজ করতেন। আর পটুয়ারা তাঁদের পট গুটিয়ে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে সামান্য চাল, পয়সা যে যা দিত তাই নিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতেন।

মন্দিরের গায়ে কাজ দেখতাম অবাক বিস্ময়ে সুরুলের মন্দির দেখতে গিয়ে। ইটের গায়ে খোদাই করা কাজ। পুরাণের দেবতার, রাসলীলা কৃষ্ণলীলার নররূপী নায়ক-নায়িকারা ছোট ছোট মূর্তি হয়ে ফুটে উঠেছে দেয়ালের গায়ে। কত ফুলপাতার লতানো ছাঁদও আছে সেখানে। কবে যে সে মন্দির তৈরি হয়েছে, কত দিন আগেকার শিল্পীর দল কাজ করে গেছেন, সে আমাদের জানা নেই, তাঁরা কোথায় বাস করতেন তাও জানি না, তবু তাঁদের হাতের কাজ দেখে আনন্দ পেতাম, এইটুকু শুধু জানি।

২

দশ বছর বয়সে আমি শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম। তখনকার লাইব্রেরির দেয়ালে ফ্রেস্কো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশেষ করে মনে পড়ে 'নটীর পূজা' নাটকের শ্রীমতীর নাচের ছবিটি। আমরা থাকতাম শ্রীভবনে। সে বাড়ির বসার ঘরের দেয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রেস্কো ছিল। খুব ভালো লাগত সেই ছবিটি, যাতে আঁকা ছিল— গাছের তলায় একটি ছোট মেয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সবুজ ঘাসের উপর থেকে শিউলি ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে। অজন্তার ছবি দেখিনি, কিন্তু সেখানকার ধরনেই পদ্ম-লতা, লতার ভেতর হাঁস, গোল করে ঘুরিয়ে-দেওয়া লতার মধ্যে হাতি— এ সব দেখতাম দেয়ালে। তখনকার শিশু বিভাগের ছোট ছেলেরা যে বাড়িতে থাকত (সন্তোষালয়) সেখানেও অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা ছিল দেয়ালে।

আমাদের ছবি-আঁকার ক্লাস হত। বোর্ডের গায়ে চকখড়ি দিয়ে কিছু এঁকে দিতেন শিক্ষকমশাই, আমরা সেগুলি দেখে খাতায় আঁকতাম। কখনও জবা কাঞ্চন কিংবা পলাশ তুলে এনে দেখে দেখে আঁকতে বলতেন। নিজেদের দেখা কোনও দৃশ্য মন থেকে আঁকতে বলতেন কখনও। আঁকাজোকায় আমি কোনওদিনই নিপুণ নই, কিন্তু বন্ধুরা অনেকেই খুব ভালো আঁকত। কাদামাটি দিয়ে যা খুশি তৈরি করার ক্লাসও

ছিল। আমাদের চেয়ে দু'ক্লাস ওপরে পড়ত আশিসদা, আমার বন্ধু সেবার দাদা, মাটি দিয়ে সুন্দর মূর্তি গড়ত। জাপানি কবি নোগুচি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে, তাঁকে দূর থেকে দেখে তাঁর অপূর্ব মুখ গড়েছিলেন। শিশু বিভাগের বারান্দায় সেটি অনেক দিন রাখা ছিল।

শ্রীভবনের পশ্চিম দিকে কলাভবন। কলাভবনের নন্দনবাড়িটি ছিল শ্রীভবনের পাশে। আমি শান্তিনিকেতনে থাকতেই কলাভবনের মাটির হস্টেলবাড়িগুলি তৈরি হল। আমরা দেখতাম মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু কলাভবনের ছেলেদের নিয়ে দেয়ালের গায়ে মাটির কাজগুলি করতেন। যখন শেষ হল, কালো রং-এর দেয়ালে সেই কালো কাজগুলি কী ভালোই না দেখতে হল। তখনকার শান্তিনিকেতনে সকলেই সকলকে চিনত। কলাভবনের ছেলেরা অনেকেই আমাদের স্নেহ করতেন, কখনও বা প্রশ্রয়ও দিতেন। রামকিংকরদা কলাভবন হস্টেলের দক্ষিণে কিছুটা জমি পরিষ্কার করে কাজ করতে শুরু করলেন। মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতাম। একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। প্রথমে আমরা বুঝতে পারছিলাম না, ধীরে ধীরে ধরতে পারলাম, ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হচ্ছে। সেই মূর্তি শেষ হল একদিন। কী প্রশান্তি বুদ্ধদেবের মুখে!

বুদ্ধমূর্তির একটু দূরে, পশ্চিম দিকে, আবার কিংকরদা কাজ শুরু করলেন। প্রায় রোজই একবার করে যাই, দেখে আসি, ধীরে ধীরে কাজ এগোয়। কিংকরদাকে জিজ্ঞেস করলে হেসে বলেন, "দেখোই না, শেষ অবধি কী দাঁড়ায়।" দেখতে দেখতে মনে হয়, এক রোগা লম্বা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বা মাথায়, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, একটি পাত্রে যেন কিছু খাবার। বুদ্ধদেবের যে দিন বোধি বা সিদ্ধি লাভ হল, সে দিন সুজাতা নামে এক অতি সাধারণ নারী তাঁকে পায়েস খাইয়ে ধন্য হয়েছিলেন। কিংকরদার কাজ শেষ হলে মনে হল, যেন আমাদের জয়াদির (আপ্পাস্বামী) মতো কে যেন সুজাতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরে কিংকরদা পুরোনো অতিথিশালার (শান্তিনিকেতন নামে আদি বাড়ি) সামনে সিমেন্ট দিয়ে যে কাজটি করেন, সেটি আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। অনেক মাথা খাটিয়ে একদিন একে বিমূর্ত শিল্প বলে কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম কিংকরদাকে। হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "যে দেখবে, তার চোখ তার মন যা বুঝবে এ তাই।"

তার পর চীনাভবন হল, হিন্দিভবন হল। কলাভবনের অনেককে নিয়ে মাস্টারমশাই কাজ করতেন, আমরা দূর থেকে দেখতাম। চীনাভবন আর হিন্দিভবন কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হয়। হিন্দিভবনের কাজ অনেকটাই বিনোদদা করেন। মধ্যযুগের সন্তকবিদের জীবন নিয়ে তাঁর অসাধারণ ফ্রেস্কো ভোলার নয়। উত্তরায়ণের ভেতরে বিখ্যাত 'শ্যামলী' বাড়ি। তার দেয়ালে মাটির কাজ মাস্টারমশাই ও তাঁর শিষ্যদেরই করা। গান্ধীজি শান্তিনিকেতন এলে সেই বাড়িতে থাকতেন।

কলাভবনের আর একটি যে ধারা আছে— কারুশিল্প; সেটিও বলার মতো। বিদেশি শাসনে আমাদের নিজস্ব শিল্প সব মরে যাচ্ছিল। ইংরেজি ধরনের সূচিশিল্পের

খুব কদর তখন। প্রতিমা দেবী এবং কলাভবনের বড় মেয়েরা দেশের নানা অঞ্চল থেকে খুঁজে খুঁজে কাথিওয়াড়ের গুজরাতি লখনউয়ের-এর ছুঁচের কাজ নিজেরা শিখে এসে সকলকে শেখাতে লাগলেন। আমাদের বাংলাদেশের মা ঠাকুমার নকশিকাঁথাও পড়ে রইল না। শুধু ছুঁচের কাজই না, জাভা বালির বাতিক শিল্প, রাজস্থানের বাঁধনি— এসবও শেখানো শুরু হল। শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনে তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, পটারি, কাঠের আসবাব তৈরি— এ সবের দেশজ ঐতিহ্যের রীতি জাগানোর অবিরাম চেষ্টা চলছিল। আমরা ছোটরা এত কিছুতে যোগ দিতে পারিনি, তবে মেয়েদের নিয়মিত তাঁতে আসন বোনা ও ছেলেদের কাঠের কাজ করতেই হত।

শান্তিনিকেতনের যে-কোনও উৎসবে মাস্টারমশাই নন্দলালকে দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সভা সাজাতেন। সিংহসদনের নাট্যশালায় রংবেরঙের কাপড় দিয়ে সাজাতেন। লাইব্রেরির সামনে চিত্রাঙ্গদা বা শাপমোচন নৃত্যনাট্য হবে কিংবা আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসব হবে, সাজানোর ভার তাঁরই থাকত। লাল মাটি দিয়ে প্রাঙ্গণ লেপে তার উপর কত সুন্দর বড় বড় আলপনা দিতেন কলাভবনের মেয়েরা। যারা উৎসবে নাচবে, গাইবে কিংবা অভিনয় করবে, তাদের সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া কাজটিও করত কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরাই। অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে কী সুন্দর করে তাঁরা সাজাতেন, দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। নানা রঙের ফুলের গয়না ও মালা দিয়ে তাঁরা সোনার সাজকে হার মানাতেন।

শান্তিনিকেতনের সকল কাজের উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রেরণাতেই আনন্দে কাজ করে যেত সকলে। সমস্ত উৎসবে যারা অংশ নিত, তাদের মাঝখানে তিনি সভা আলো করে বসে থাকতেন। তাঁকে দেখতে সব সময় সুন্দর লাগত। আমাদের নিজের সবচাইতে ভালো লাগত তিনি যখন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসতেন। নাচগানের মাঝে মাঝে তিনি পাঠ করতেন, আবৃত্তি করতেন। তাঁর অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়নি, তাঁর গানও শুনিনি, তবে শান্তিনিকেতনে যে কাজে তিনি থাকুন, তাঁর অপার উৎসাহ যে সকল সৃষ্টির মূলে ছিল এটুকু বুঝতে পারতুম। 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শাপমোচনে'র যখন রিহার্সাল হত উত্তরায়ণের পশ্চিমদিকের বড় ঘরে, তাঁকে ঘিরে সকলে বসতেন। তিনি মন দিয়ে গান শুনতেন, নাচ দেখতেন, কোথাও কোনও ত্রুটি হলে শুধরে দিতেন। অভিনয়ে হয়তো বলার ধরনটা বদলে দিতেন। আমরা ছোটরা যারা কোনো অংশ নিইনি, আমরাও থাকতাম সেখানে। তাঁর সান্নিধ্যে আমরা ধন্য হতাম আর আমাদের দেখার চোখ, বোঝার মন খুলে যেত।

অগস্ট আন্দোলনে বোলপুরের মেয়েরা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে থাকার জন্য ইংরেজ সরকার ভারতকে ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে। কংগ্রেস প্রতিবাদ জানায়। আগে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক, তবে ভারতবাসী গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করবে। ব্রিটিশ পক্ষ থেকে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

১৯৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে জাপানের হাতে মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অধিকৃত হলে এ দেশের মানুষ কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কলকাতার লোকেরা জাপানি বোমার ভয়ে দলে দলে অন্য কোথাও চলে যেতে থাকে, ইংরেজের পতন হলে যদি জাপানিরা এসে পড়ে, কীভাবে তাদের প্রতিরোধ করা হবে এ বিষয়ে তারা কোনও চিন্তাও করতে পারে না। ভীতিবিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেশবাসীর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা ভাবেন।

৪২-এর ৬/৭ অগস্ট বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮ অগস্ট কংগ্রেসের নেতাদের প্রায় সকলকেই গ্রেফতার করা হয়। ৯ অগস্ট এ খবর প্রচারিত হলে বিক্ষুব্ধ দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে সামিল হন। গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, "হিন্দুস্তানে জ্বালামুখী ফুটছে, যে যেখানে থাক এই আগুনে ঝাঁপ দাও।

তোমাদের মন্ত্রধ্বনি হোক 'করব নয় মরব', 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'।" আন্দোলনে গান্ধীজির নির্দেশযুক্ত শেষ হরিজন পত্রিকাখানি সরকারপক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কোনওভাবে গোপনে শক্তি প্রেস থেকে মুদ্রিত একখানি বাংলা হরিজন পত্রিকা বাবার কাছে পাঠানো হয়। আমার বাবা হংসেশ্বর রায় সেই পত্রিকাটি তাঁর হস্তলিপিতে সাইক্লোস্টাইল রীতিতে ছেপে তখনকার বোলপুর কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের হাতে পৌঁছে দেন। বোলপুর কংগ্রেসের এক প্রধান পুরুষ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এই আন্দোলনে যোগ দিতে বোলপুর আসার পথে হাওড়া স্টেশনে গ্রেফতার হন।

দু'এক দিনের মধ্যেই স্কুলের ছেলেরা 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে স্কুল থেকে বের হয়ে এল। বোলপুরের পথে পথে জাতীয়পতাকা হাতে শোভাযাত্রা করে সারা শহর পরিক্রমা করে তাদের মিলিত কণ্ঠের মন্ত্রধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। ছেলের দল আইন অমান্য করার জন্যই সেই সময় ট্রেনে টিকিট না কেটে নিকটবর্তী স্টেশনগুলোতে বারেবারে যাতায়াত করছিল। রেলগাড়ির কামরা থেকেও তাদের 'করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গে', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'বন্দেমাতরম্' ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সেই সময় বোলপুর স্টেশনের মালগুদামে জমা হয়েছিল কয়েকশো বস্তা চাল। যুদ্ধের প্রয়োজনে সেই চাল বাইরে পাঠানো হবে জেনে সত্যাগ্রহীরা সেখানে পাহারা দিতে লাগল। জাতীয়-পতাকা হাতে, মুখে তাদের নানান ধ্বনি, বারে বারে তারা বলতে লাগল— "বোলপুরের চাল এখানকার মানুষদের জন্যই রাখতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ সৈন্যদের অন্ন জোগাবার জন্য দেশের মানুষকে অনশনে রাখা চলবে না।" তাদের সম্মিলিত উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে গমগম করতে লাগল স্টেশনের মালগুদামের চত্বর। অন্য দিকে লালপাগড়ি পুলিশের দল সারা দিনরাত চালের বস্তাগুলিকে সত্যাগ্রহীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য লাঠি হাতে বন্দুক কাঁধে বস্তাগুলির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল।

বোলপুর কাছারি বন্ধ করার জন্য কাছারির মূল গেটে মেয়েরা পিকেটিং করতে লাগল। আমাদের ঘরের ছোট ছোট বোনেরা, কারও বয়স ১০-১২, কারও-বা ১৪-১৫ এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এল। আজকের দিনের মতো মেয়েদের বাইরের জগতে পা রাখা তখন সহজ ছিল না। তবু দেশের ডাকে ভেতরের শাসন অগ্রাহ্য করে তারা এসেছিল। লায়েকবাড়ির বাল্যবিধবা সুনীতি পিসিমা, তাঁর দুই ভাইঝি ছায়া-মালতী, হাটতলার মুসলমান বোন আল্লারাখী, আমাদের বাড়ি থেকে বোনেরা সতী অন্নপূর্ণা বর্ষা, আর বিশ্বনাথ রাওয়ের স্ত্রী মমতা— মূলত এরাই প্রধান কর্মী ছিল। দাদুর শাসন এড়িয়ে বর্ষা শেষের দিকে আর আসতে পারত না।

শান্তিনিকেতন থেকে দু'এক দিন এসেছিলেন রানি চন্দ ও নন্দিতা কৃপালিনী। গেটের মুখে হাতে হাত ধরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকত। চোখে তাদের স্থির দৃষ্টি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় টানটান তাদের মূর্তি। সেই অবরোধ ভঙ্গ করে হাকিম কোনওমতে কাছারিতে প্রবেশ করতে পারছেন না। যতবার তিনি অগ্রসর হচ্ছেন ততবারই তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। ও দিকে কাছারির ভেতরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত আছে একদল পুলিশ, হাতে তাদের লাঠি ও বন্দুক। মাঝে মাঝে হুংকার ছেড়ে তারা লাঠি ও বন্দুক ঠুকছে মাটিতে। মেয়েদের চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তারা কথায় না বলে যেন ভঙ্গিতে বলছে, 'ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' কাছারির সামনের পথে আমার পিসেমশাই যতীন্দ্রনাথ সিংহ, বিশ্বনাথ রাও ও আরও কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী জাতীয় পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দিতে চলাফেরা করছেন আর অবস্থা নিরীক্ষণ করছেন। পথের উল্টো দিকে হাকিম সাহেবের কোয়ার্টার্স। তার উত্তর দিকে একটা ছোট রাস্তা। তার অদূরে এক বিশাল আমগাছ ছিল। সেই গাছের তলায় জড়ো হয়েছে আমাদের পাড়ার সমস্ত মায়েরা। মনে হচ্ছে তারা যেন স্তব্ধ দর্শক। কিন্তু তা তো নয়। এই অভূতপূর্ব পরিবেশে পুলিশের গুলি যদি ছোটে, তাঁরা আগে গিয়ে সত্যাগ্রহী মেয়েদের আগলে নিজেরা গুলি খাবেন। অতি সাধারণ বেশে সাদাসিধে করে কাপড় পরা ঘোমটা মাথায় স্বল্পশিক্ষিতা রক্ষণশীল ঘরের মায়েরা কঠিন এক ব্রতের যেন শরিক হতে চলেছেন। তাঁরা রাজনীতি বোঝেন না, কিন্তু দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ছোট মেয়েদের অহিংস সত্যাগ্রহ তাঁদের মনেও দেশপ্রেমের এক উন্মাদনা জাগিয়েছে। প্রতিদিন নিজেদের কাজ সেরে নিয়ে তাঁরা হাজির থাকতেন ওই আমগাছের তলায় মহৎ আবেগ নিয়ে। যেন পবিত্র আলোকশিখায় তাঁরাও জ্বালিয়ে নিতে চান তাঁদের প্রাণের প্রদীপগুলি। এমনি করেই চলতে লাগল দিনের পর দিন। আরও কয়েক দিন।

এরই মধ্যে কোনও এক রাতের গভীরে আমাদের শোওয়ার ঘরের জানালার তলায় শোনা গেল এক কণ্ঠস্বর। 'হংসদা, হংসদা উঠুন। গোপনে অন্ধকারে ওরা গ্রেফতার করেছে আমাদের সকল কংগ্রেস কর্মীকে এবং অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকেও। যতীনদাও হয়তো গ্রেফতার হলেন এতক্ষণে" (জ্ঞাতার্থে জানাই শারীরিক দীর্ঘকালীন অসুস্থতকার কারণে বাবা এই আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হতে পারেননি) বাবা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। আমিও বাবার সঙ্গ নিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে পিসেমশাই-এর বাড়ি। মাঝখানে কাছারি। কাছারি ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে দেখি কয়েকজন পুলিশ ও একজন অফিসার পিসেমশাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। নিশুতি রাতের নিঝুম অন্ধকারে চারিদিকে নিস্তব্ধ। কেবল কয়েকজোড়া বুটের সশব্দ ধ্বনি ছন্দপতন ঘটিয়ে চলেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিপরীত দিক থেকে

আমাদের আসতে দেখে তারা জোরে ধমক দিয়ে উঠল 'তফাত যাও' বলে। পিসেমশাই-এর মুখে মৃদু হাসি। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম 'বন্দেমাতরম্' বলে। পরক্ষণেই বন্দেমাতরমের প্রতিধ্বনি শুনে দেখি থানপরা বাল্যবিধবা আমার বড়মা ও জ্যাঠাইমা খালিপায়ে এগিয়ে আসছেন। পুলিশ অফিসার গোপনে নিভৃতে যেটা করতে চেয়েছিলেন তা হল না বুঝেই তাদের গতি বাড়িয়ে দিল। আমরা তাদের থেকে পিছিয়ে পড়লাম। ততক্ষণে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি অনেক মানুষকেই জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের পাড়ার মোড়ের থেকে আরও মায়েরা আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমরা স্টেশনে গিয়ে দেখলাম সেখানে কেউ নেই। থানার দিকে এবার আমরা ছুটে চললাম। কিছুটা এগিয়ে রেলের সাঁকোর ওপর থেকে দেখলাম, থানার ঠিক পাশে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। প্রাণপণ দৌড়তে দৌড়তে থানার সামনে দিয়ে ট্রেন অভিমুখে যাচ্ছে কনেস্টবলগুলো। ভাবতেই পারেনি যে এভাবে মেয়েরা আসতে পারে। তারা বাধা দেবার আগেই আমরা ট্রেনের কাছে পৌঁছে গেলাম। যে মুহূর্তে আমরা এলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা যতদূর সম্ভব উচ্চস্বরে 'বন্দেমাতরম্' 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনি দিতে লাগলাম। আমাদের সেই প্রাণপণ কণ্ঠস্বর ট্রেনের ভেতরে আমাদের আপনজনদের কানে পৌঁছে গেল। তাঁরাও তখন জোরে প্রতিধ্বনি দিতে লাগলেন। ট্রেনের গতি দ্রুত হতে লাগল। আমাদের মনে হল ওরা পারেনি। শত্রুপক্ষ ভেবেছিল দেশকর্মীদের লুকিয়ে নিয়ে পালাবে। বোলপুরের মেয়েরা তা হতে দেয়নি। দীর্ঘ কারাবাসের পর ফিরে এসে আমাদের সেই কাছের মানুষগুলি বলেছিলেন, জননী-ভগিনী ও কন্যাদের দীপ্র জয়ধ্বনি তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিচ্ছেদের বেদনা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। যাত্রাপথ আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। ট্রেনের গতি বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে তা চোখের আড়ালে চলে গেল। আমরা ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় সাঁকোর ওপর থেকে বহু মানুষের কলরোল ভেসে আসতে লাগল। বোলপুরবাসীরা শেষরাতে উঠে পড়ে সরকারপক্ষের এই গোপন অভিযানের কথা জানতে পেরে রাগে-দুঃখে বিশাল মিছিল করে নানান ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে থানার দিকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেই মিছিল সারা বোলপুর প্রদক্ষিণ করল। সে দিন হরতাল ঘোষণা করা হল। কাছারি বন্ধ থাকায় মেয়েদের সত্যাগ্রহ আর হল না। দুপুরে স্কুলের পিছনে আমবাগানে হাজার মানুষের এক জনসভায় বাবার সভাপতিত্বে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হল। সভায় বক্তব্য রাখলেন হাট-সেরান্দীর শক্তিপদ রায়। সেই সভায় চারপাশের গ্রাম থেকেও অনেক মানুষ এসেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। সভা ভাঙার পর বিকেলের কাছাকাছি তাঁরা যখন ফেরার মুখে তখন 'আমার কুটির'-এর বিপ্লবীদের পরিচালিত তির-ধনুকধারী সাঁওতালদের এক বিশালবাহিনী দেখতে পেলেন। তারা

স্টেশন আক্রমণ করে চাল গুদামের চাল লুট করতে যাচ্ছে জেনে সভা ফেরত জনতাও তাদের সঙ্গ নিলেন। স্টেশনে পৌঁছবার আগে সাঁইথিয়া রামপুরহাটের দিকের টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। স্টেশনে পৌঁছে স্টেশনমাস্টারকে মারধর করে স্টেশনের আলমারি টেবিল চেয়ার ভাঙা ও কাগজপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তছনছ করে দেওয়া হয়। উত্তর দিকের টেলিফোনের তার কাটা হলেও দক্ষিণে ভেদিয়ার দিকে তার কাটা হয়নি। স্টেশনমাস্টার কোনওভাবে ভেদিয়াতে টেলিফোন করতে সক্ষম হন। তখন সেখানে একটি সৈন্যভর্তি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ট্রেনটি অল্পক্ষণের মধ্যে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে যায়। স্টেশনের ভেতরে যারা ছিল তাদের লাঠি চার্জ করে তাড়িয়ে দিয়ে সৈন্যরা মাল গুদামের চালের বস্তার আড়াল থেকে গুলি ছুড়তে থাকে। আন্দোলনকারী সাঁওতালরা তির ছুড়তে থাকলে দু'এক জন সৈন্য আহত হয়। এ দিকে গুলির আঘাতে কালকেপুরের তারাপদ গুঁই নিহত হন। নিহত হন জটা মাঝি। আর বেশ কয়েকজন আহত হন। গুলিবিদ্ধ মানুষগুলিকে তুলে নিয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মাঠ দিয়ে কোনওক্রমে হাসপাতালে তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হয়।

আমরা বাড়ি থেকে প্রচণ্ড কোলাহল শুনে ছাতে উঠি, কিন্তু কিছু দেখতে পাই না, পরে ভেদিয়ার দিক থেকে মিলিটারি ট্রেনটিকে আসতে দেখি। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের শব্দ শুনতে পাই। মনের মধ্যে তোলপাড় চলে। কী জানি কার কী সর্বনাশ হয়ে গেল। অনুমানে নানানজনের নানা অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমরা যখন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত, তখন দেখতে পাই ক্লান্ত পায়ে ম্লানমুখে এক এক করে ফিরে আসছেন এখনও যাঁরা গ্রেফতার হননি সেই সব কর্মী হাবুকাকা বিশ্বনাথ রাও। আরও কেউ কেউ যাদের নাম আর এত দিন পরে মনে করতে পারছি না। আমাদের বাড়ির উঠোনে সবাই জড়ো হলেন। ঘণ্টাখানেক পরে জানা গেল শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। চারজন মানুষ এক জায়গায় জড়ো হলেই গ্রেফতার করা হবে। সভা শোভাযাত্রা সব নিষিদ্ধ। বন্দুক লাঠিধারী সৈন্যরা বড় রাস্তায় মার্চ করছে। পরের দিন জানা গেল প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে পিটুনি কর ধার্য করা হয়েছে। আমাদের বাড়ির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি অর্থমূল্যের কর চাওয়া হয়েছিল। এমনি করে শেষ হয়ে গেল বোলপুরের অগস্ট আন্দোলন। হাবুকাকার মতো কয়েকজন ধরা দেননি। বহু দিন ধরে লুকিয়ে ছিলেন। সে সময় তাঁদের অনেক কষ্ট হয়েছিল কিন্তু তাঁদের মুখের হাসি ম্লান হয়নি। শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এ ছিল তখনকার বোলপুরের মানুষদের সংঘবদ্ধ এক ক্ষুদ্র প্রতিরোধ। আমার নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী বাবা বলেছিলেন, "এখানকার সত্যাগ্রহীরা তাদের অহিংস আন্দোলন আরও অনেক দূর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন যদি ওই বিপ্লববাদী সংগঠন পরিচালিত তির-ধনুক-

লাঠি-বল্লমে সজ্জিত শোভাযাত্রাটি স্টেশনে লুটপাটের ঘটনাটি না ঘটাত।" পরে মেদিনীপুরের অহিংস বিপ্লবের কাহিনি বিশেষ করে এক বছর ধরে তাঁদের স্বাধীনতালব্ধ উজ্জ্বল শাসন, মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরার গৌরবময় আন্দোলনের কথা শুনে গর্বে আমাদের বুক ভরে ওঠে। মনে হয় আমরা যা পারিনি ওঁরা তা করে দেখিয়েছেন। আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়ত শান্তি কুণ্ডু। তার ভাই ধ্রুব। সুন্দর দেখতে ছিল তাকে। বড় বড় চোখ একমাথা কোঁকড়া চুল, ফরসা রং। সব মিলিয়ে শৈশবে মাতৃহারা কিশোরটি— তার স্বভাব সৌন্দর্যে আমাদের সকলের ভালোবাসার জন হয়ে উঠেছিল। বিহারের কাটিহারে থানা ঘেরাও করতে গিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে তার প্রাণের প্রদীপ নিভে যায় ইংরেজের ভাড়াটে সৈন্যদের গুলিতে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্র আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়ে চিরদিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে তার অম্লান মূর্তিটি এঁকে দিয়ে গেছে।

অগস্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে, তার আবেগ ও বেদনা আমি ফুটিয়ে তুলতে পারব কি না জানি না। তবু এত দিন পরে সে কথা লিখে সকলের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে চাই। কলকাতা থেকে জামালপুরে গিয়েছিলেন আমার স্বামী তাঁর বোনকে আনতে। আমার কোলে তখন দু'মাসের শিশুকন্যা। যে ট্রেনে তিনি গিয়েছিলেন সেই ট্রেন বিহারে পৌঁছল কি না তা জানা যায়নি। অগস্ট আন্দোলনে বিহারে মাইলের পর মাইল রেললাইন তুলে ফেলা হয়েছিল। সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। নানাজনে নানাভাবে সান্ত্বনার ছলে অনেক অশুভ সম্ভাবনার কথা জানিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনি করে কেটে গেল এক মাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলদোলানি চলতেই লাগল, কোনও খবর এসে পৌঁছল না। যে দিন বোলপুরে মহাকাণ্ড ঘটে গেল সেই দিন আমাদের বোনেরা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল তাদের জামাইবাবু আসছেন। বাড়িসুদ্ধ সবাই জড়ো হলেন তাঁর পাশে। কেউ মিষ্টি আনলেন, কেউ জল আনলেন, কেউ বা পাখা করতে বসলেন। তার পর শোনা হল কীভাবে তিনি এসেছেন নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে ভাগলপুর, তাব পর কোথাও গোরুর গাড়ি, কোথাও বা ঘোড়ার গাড়ি করে দুমকা। দুমকা থেকে কোনও এক ভদ্রলোকের ট্রাকে রামপুরহাট। রামপুরহাট থেকে মালগাড়িতে বোলপুর।

এখানে এসেও কলকাতা যাওয়ার অসুবিধার জন্য থেকে যেতে হল পক্ষকাল। বোলপুর হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ আহতদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সঙ্গে ছিলেন আমাদের বালবিধবা সুধীরাদি। যিনি নিজের চেষ্টায় পরে অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হয়েছিলেন। অগস্ট আন্দোলনের কথা মনে ভেসে এলে স্মৃতিমেদুর আমি পিছনে ফেলে আসা সেই দিনগুলি নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি।

বোলপুরের শিক্ষাগার

গান্ধীজির অনুগামী বোলপুরের কংগ্রেসকর্মী হংসেশ্বর রায় ১৯২৮-২৯ সাল নাগাদ সাধারণ পাঠাগারের পাশে একটি খাদি আশ্রম গড়ে তোলেন। সেখানে চরকা কাটা তুলো ধোনা তাঁতে কাপড় বোনা চলতে থাকে। গান্ধীজির বই, 'হরিজন' পত্রিকা ইত্যাদি পাঠ ও আলোচনাও হত সেখানে। এই কাজে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে কাছে পেয়েছিলেন তিনি।

১৯৩০ সালে গান্ধীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লবণ-সত্যাগ্রহের সময় ডা. আশুতোষ দাস, নির্মলকুমার বসু, সুধীরচন্দ্র লাহা, মলয়কুমার বসু বোলপুরের ভিতর দিয়ে কাঁথি অভিমুখে চলেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যতগুলি গ্রামে সম্ভব কংগ্রেস এবং সত্যাগ্রহের বাণী পৌঁছে দেওয়া। বোলপুরে এসে তাঁরা শোনেন সবরমতী আশ্রমে সস্ত্রীক বসবাস করে এসেছেন এবং গান্ধীজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল এমন একজন মানুষ বোলপুরে আছেন, যাঁর নাম হংসেশ্বর রায়। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের ভালো লাগে। তাঁরা তার পর বোলপুরে থেকে খাদি প্রচারের কাজে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। খাদি-আশ্রমটি পাঠাগারের পাশ থেকে হাটতলার কাছাকাছি উঠে আসে। আশ্রমটির নাম হয় খাদি সংঘ। পুরোনো একটা বাড়ির মস্ত একটা

হলঘর, দু'পাশে দুটি ছোট ঘর, সামনে খানিকটা খালি জমি, একপাশে একটি শৌচাগার। সামনের জমিতে কাপাসের চাষ করা হয়েছিল। সেখান থেকে তুলো তুলে আনা, বিচি ছাড়ানো, তুলো ধোনা, পাঁজ তৈরি করা, সেই পাঁজ দিয়ে চরকায় সুতো কাটা, তার পর সেই সুতো দিয়ে খাদির কাপড় বোনা— খদ্দর নামে যার পরিচিতি— এই সব কিছু কাজই চলত আশ্রমে। খাদি সংঘকে কেন্দ্র করে চলত হরিজন কল্যাণের কাজও, আর ছিল হাটের দিনে মাদকদ্রব্যবিরোধী পিকেটিং। অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলন তখন বিপুল গতিতে চলছে। এই আশ্রমের কাজকর্মে যুক্ত হয়ে আমার মতো বালিকাও সে আন্দোলনে শামিল হতে পেরেছি।

ওই খাদিসংঘের সমস্ত দেয়াল জুড়ে মোটা কাগজ লাগানো ছিল, তার উপর সুন্দর ভাষায় সহজ করে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখা ছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন কেন প্রয়োজন এবং কী তার পশ্চাৎপট তার বিবরণ। আশ্রমে নিয়মিত 'হরিজন' পত্রিকা আসত, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজির নির্দেশ থাকত সে কাগজে। বোলপুরের জনসাধারণকে গান্ধীজির আদর্শের কথা জানাতে কালী-বারোয়াতী তলায় কিংবা হানুবাবুর দুর্গাবাড়ির উঠোনে সভা হতে লাগল। বোলপুরের পথে যখন কোনও মহিলা পা রাখতেন না, সেরকম সময় হংসেশ্বর রায়ের স্ত্রী পঙ্কজিনী রায় বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জন্য আন্দোলন করতে লাগলেন।

ব্রিটিশ রাজশক্তি সেবাব্রতী এই সব মানুষগুলিকে আর ছোট করে দেখতে পারল না। একদিন খাদি সংঘের সত্যাগ্রহীদের পুলিশ একসঙ্গে গ্রেফতার করল। এই খবর শোনা মাত্র বোলপুরে বেশির ভাগ বাড়িতে সে দিন রান্না হল না, দোকানপাট সব বন্ধ রইল। হাতকড়া পরা সত্যাগ্রহীদের নিয়ে এই অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা দেখতে সারা বোলপুরের মানুষ স্টেশনের আশেপাশে ভেঙে পড়ল।

বেশ কিছু দিন— মনে হয়, এক বছর পরে সত্যাগ্রহীরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেন। খাদি সংঘের ভাড়া বাড়িটির মালিক বাড়ি ছেড়ে দিতে বললে নির্মলকুমার বসু রাম-সায়রের পাড়ে বাবুর বাগানের উত্তরে যেখানে জল-অচল নিম্নবিত্তের বাস, সেই পাড়ায় এক টুকরো জমি কিনলেন। সেখানে দুপাশে দুটি ছোট ঘর মাঝখানে খোলা প্রশস্ত বাঁধানো মেঝে, উত্তরে একটু বাগান করার জায়গা, দক্ষিণে কিছুটা মাঠের মতো। পুব দিকে একটু উঁচু জায়গায় একটা বড় আমগাছ। ইতিমধ্যে মলয়কুমার বসুর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতিতে তাঁর মা একটি কুয়ো কাটানোর জন্য টাকা পাঠান। কুয়োটি হয়ে গেলে সকলের পানীয় জলের কষ্টের অবসান হল। দুটি ঘরের মাঝখানের জায়গাটিতে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হল। সেখানে

আরম্ভ হল বয়স্ক-শিক্ষার আসর। যে সব ছেলে দিনে রাখালের কাজ করত তারাও আসত ওই নৈশ-বিদ্যালয়ে। এর নাম রাখা হল 'শিক্ষাগার'। তুলো ধোনা, তকলি ও চরকার সুতো কাটা ইত্যাদি খাদির কাজও একই সঙ্গে চলতে লাগল। খাদি সংঘ শিক্ষাগারে রূপান্তরিত হলে হংসেশ্বর রায় তার সম্পাদক হলেন। নির্মলকুমার বসু তার প্রাণপুরুষ আর গোপেশ্বর দাস (হাবু) তার সর্বক্ষণের কর্মী। শিক্ষাগারের সবচেয়ে কাছে ছিল শশীদাদার বাড়ি। শশীদাদা জাতে মুচি ছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জনের ব্রত হিসাবে শশীদাদার বাড়িতে নিয়মিত জলপান একটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল। মাটির কলসির শীতল জল ঝকঝকে মাজা কাঁসার গেলাসে যখন পরিবেশিত হত সে বড় তৃপ্তির বিষয় ছিল। ও পাড়ার হাড়ি বাউরি ডোম মুচি সকলেই শিক্ষাগারকে তাদের অতি আপনার বলে জানল। যদিও তারা হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ ছিল। জাতিভেদ প্রথা তাদের নিজেদের মধ্যে ভালোরকমই ছিল। রামসায়রের পশ্চিম পাড়ের পাঁচু হাড়ি অন্য জাতের একটি মেয়েকে নিয়ে ঘরকন্না করত বলে তাকে আর জাতের সবাই একঘরে করেছিল। তার মৃত্যুর পর যখন দাহ করার কোনও লোক পাওয়া গেল না তখন হংসেশ্বর রায় শিক্ষাগারের অন্যদের সাহায্যে তাকে দাহ করে এলেন। জাতিগত বৃত্তি অনুযায়ী কাজ পাবার এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি জাতিভেদ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের নিজের সমাজ সম্বন্ধে গভীর বোধ ও চেতনাই এই নীচের থাকের মানুষগুলিকে তাদের সামাজিকতা ও দায়িত্বজ্ঞান রক্ষায় সচেষ্ট করেছিল। ও পাড়ার মানুষেরা যাঁরা দিনে রোদে পুড়ে জলে ভিজে শীতের দিনের কাঁপুনি নিয়েও আনন্দে সারাদিন চাষের কাজ করতেন, শিক্ষাগারের নৈশ-বিদ্যালয়ে তাঁরা অনেকেই ভালোভাবে লিখতে পড়তে শিখেছিলেন। নির্মলকুমার বসু, হংসেশ্বর রায় ও গোপেশ্বর দাস রামসায়রের পাড়ের অন্ত্যজ সমাজের প্রতিটি মানুষকে আলাদাভাবে জানতেন, তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের কারণে তারাও তাঁদেরকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন।

শিক্ষাগারে বহু মহান মানুষের আনাগোনা ছিল, শান্তিনিকেতন নিকটবর্তী হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রের পুত্র অশোক মৈত্র, নবকৃষ্ণ চৌধুরী (পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী), প্রিয়রঞ্জন সেন, অনাথনাথ বসু, সনৎকুমার ভট্টাচার্য, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়— এঁরা সকলেই মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করেছেন। হরিজন স্মারক নিধির কর্মকর্তা ঠক্কর বাপা, সুচেতা কৃপালিনীও এসেছিলেন এখানে। নিয়মিত আসতেন সীমান্ত গান্ধীর পুত্র কলাভবনের ছাত্র আবদুল গনি খান। তাঁর পিতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খান হাজারিবাগ জেল থেকে

মুক্তিলাভ করেই পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শান্তিনিকেতন আসেন। সেখান থেকে সেই অসাধারণ মানুষটি এই গরিব নিম্নবর্গের মানুষদের পল্লিতে পায়ের ধুলো দেন। তাঁর দর্শন লাভ করে শিক্ষাগারের কাছের মানুষরাই শুধু নন , বোলপুরের জনসাধারণও ধন্য হয়েছিলেন। বীরভূমের মানুষ যাঁরা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে খয়রাশোলের সুরেন সরকার, কীর্ণাহারের কামাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জাজীগ্রামের লালবিহারী ও সন্ধ্যা সিং, তাঁতিপাড়ার পিসিমা, ডা. ফুলরেণু গুহ— এঁরা পরের দিকে আসতেন। এই শিক্ষাগার গান্ধীজির কর্মকাণ্ডের এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বোলপুরের ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, রমণীমোহন সেন, শশধর চৌধুরী, অতুল সেন এঁরাও সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

শিক্ষাগারে আসতেন নানা মতের নানা মানুষ। রায়পুর থেকে আসতেন ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়। তিনি গান্ধীজির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন বিপ্লবী, তবু শিক্ষাগার ও তার কর্মীদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কবিরাজ সৌরীন্দ্র সেন অন্য রাজনীতিতে বিশ্বাস করলেও শিক্ষাগারের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। পরের দিকে সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশের জেলে ৯ বছর থেকে বোলপুরে এলেন। দু'বছর রাজবন্দির জীবনযাপন করে যখন তিনি ছাড়া পেলেন, তখন তিনিও আসতেন শিক্ষাগারে। ১৯৩৭ সালে একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন হয়, তার পরে এখানে একটি ছোট ঘর করা হয়। শ্রদ্ধেয় আবুল হায়াৎ সাহেব এখানে সপরিবার দু'বছর কাটান। শিক্ষাগারে তিনি শিক্ষকতা করেছেন সেই দু'বছর। তাঁর মতো পণ্ডিত মানুষ এই গরিব মানুষগুলিকে দিনে রাতে যখন যার সুবিধে সেই মতো শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাগারের একটি অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যও তাঁর জন্য গড়ে ওঠে। পরে জওহরলালজির আহ্বানে তাঁর লিখিত বইগুলির সম্পাদনার জন্য তাঁকে এলাহাবাদে চলে যেতে হয়। ১৯৪০-এ গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন তিনি স্বয়ং দরিদ্র হরিজন মানুষদের পল্লিতে অবস্থিত তাঁর ভাবধারায় গঠিত এই শিক্ষাগারে এসে চিরদিনের জন্য তাঁর পুণ্য চরণের পরশ দিয়ে যান।

রেড-ইন্ডিয়ানদের মেলা

লং আইল্যান্ডের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুটা গেলে রেড-ইন্ডিয়ানদের গ্রাম আছে, তাদের আদি সংস্কৃতি এখন লুপ্ত হওয়ার মুখে, তবু যা বাকি আছে সেটুকু যাতে হারিয়ে না যায় তাই ওই গ্রামগুলিতে রেড-ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। বছরে তিন-দিন এই নিয়ম ভাঙা হয়, সেখানে তখন রেড-ইন্ডিয়ানদের মেলা বসে। মেলাতে তাদের হাতে-তৈরি নানা শিল্পদ্রব্য কিনতে পাওয়া যায়। তাদের রান্না করা বিশেষ বিশেষ খাবারও কিনে খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। মেলা ঘুরে ঘুরে প্রাচীন এক সভ্যতার টুকরো টুকরো নানা নিদর্শন দেখতে দেখতে, এক রেড-ইন্ডিয়ান সর্দারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। অনেক দূর থেকে এই উৎসব উপলক্ষে তিনি এসেছেন। মাথায় রঙিন পালক ও নানা রঙের পুঁতি দিয়ে কাজ করা শিরোভূষণ, গলায় সুন্দর করে গাঁথা পুঁতির মালা, হাতে রঙিন পালকের অলংকার পরেন। তাদের হাতে, বোনা তাঁতের হ্রস্ব পোশাক, সেও জমকালো রঙিন সুতোর কারুশিল্প— আমাদের নাগাদের পোশাকের মতো। পায়ে কালো নরম চামড়ার উপর সার সার বড় বড় ঘুঙুর দিয়ে গাঁথা নাচের বাজনা, যা একটু পরেই তালে তালে বেজে উঠবে। আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বললাম, "আমরা ইন্ডিয়ান", তবে নিবাস আমাদের

এশিয়ায়। একথা বলতেই তিনি বুঝলেন। ভারতে যদিও তিনি যেতে পারেননি, তবে দূর প্রাচ্যের অনেক দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন জাহাজ চড়ে। তাই আমাদের সম্বন্ধে ধারণা তাঁর আছে। হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। বহু রেড-ইন্ডিয়ান নারী ও পুরুষ, সঙ্গে শিশুরাও, ওই সর্দারের মতো সাজে সেজে বাজনার তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে শোভাযাত্রা করে বেশ কিছুটা গিয়ে একটা চওড়া উঁচু বেদির উপর উঠে গেলেন। তাঁরা কখনও একলা একজন, আবার কখনও একত্রে সকলে, নাচ গান, অভিনয় করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের পুরোনো পুঁথি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানও করলেন কিছু কিছু। বহু মানুষ শহর থেকে এসেছেন, তাঁরা নীচে গোল হয়ে বসে এ সব দেখছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাজ করেন এমন কয়েকটি ইন্দোনেশীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। রেড-ইন্ডিয়ানদের তৈরি খাবার খেয়ে, তাদের হস্তশিল্পের নিদর্শন কিনে, নাচ-গান দেখে খুশি হয়ে, তাদের জন্য সংরক্ষিত নিরিবিলি গ্রাম থেকে, বাইরের মানুষেরা ফিরে গেল নিজের ঘরে।

আমেরিকায় আমার ছেলে থাকে সপরিবারে। একবার ওদের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত ওরা। দেখেছি বিদেশের অনেক দ্রষ্টব্য। যা দেখেছি, তার মধ্যে এই রেড-ইন্ডিয়ানদের মেলা দেখার স্মৃতিটাই আমার মনে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

২

আমার বাবা— হংসেশ্বর রায়

আমার ছোটবেলার বোলপুরে আমাদের বাড়িটি ছিল একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। ঠিক তার পিছনে একটা ছোট রাস্তা, তার পর একটা পুকুর, নাম তার কলুপুকুর। তার পর বিস্তীর্ণ ধানখেত। দূরে দেখা যায় বাঁধগোড়া গ্রামের আভাস। আমার বাবা হংসেশ্বর রায় বোলপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন, রাজপথ ধরে যেতে গেলে ঘুর হয় এবং অনেক সময় লাগে বলে বাবা ধানখেত ধরে স্কুলে যেতেন। আমাদের ঘরের জানালায় আমি বসে থাকতাম, যতক্ষণ বাবাকে দেখতে পেতাম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। একদিন দেখি ফিরে আসছেন, অবাক হয়ে ভাবছি কী হল। বাবা নীচ থেকে বললেন, "শিগ্‌গির নীচে নেমে আয়।" নেমে যেতে আমার হাতে বইখাতাগুলি দিয়ে বললেন, "চুপিচুপি ওপরে গিয়ে রেখে দে, কেউ যেন জানতে না পারে।" আমি অবাক হয়ে কেবলই জানতে চাই স্কুলে না যাবার কারণ কী? তখন জানলাম একজন অজানা অচেনা পথিক বমি ও মলে মাখামাখি হয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর কোনও সদ্‌গতি না করে বাবা কেমন করে যাবেন? বললেন, বাড়ি ফিরতে দেরি হতে পারে, কেউ জানতে চাইলে আমি যেন বলি, তাঁর কাজ আছে আসতে দেরি হবে। বিকেল গেল, সন্ধে গেল, গভীর রাতেও অপেক্ষা করতে করতে আমি ক্লান্ত ঘুমঘুম

চোখে দেখি স্নান করে ভিজে জামাকাপড়ে বাবা ঘরে ঢুকছেন। বললেন, "বাঁচাতে পারলাম না। দ্বারিক ডাক্তার, নিবারণ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হলাম, তাই তাকে দাহ করে ফিরছি।" যে কোনও আর্ত পীড়িত মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল তাঁর প্রাণ। আজীবন তাঁকে আমি এমনই দেখেছি।

ঠাকুরদা অধরচন্দ্র রায় ছিলেন দুর্ধর্ষ বিষয়ী মানুষ। তাঁর প্রতাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। জ্যাঠামশাই বিভূতিভূষণ রায়কে রেখে তাঁর প্রথমা পত্নী দেহত্যাগ করলে তিনি কালকেপুরের সামন্তবাড়ির মেয়ে আমার ঠাকুমা নগেন্দ্রবালাকে বিবাহ করেন। পরপর কয়েকটি সন্তান বাঁচেনি, তাই ঠাকুমা হংসেশ্বরী ঠাকুরানির কাছে মানত করে বাবাকে পান, তাই তাঁর নাম হয় হংসেশ্বর।

বাবা যখন বোলপুরে স্কুলের ছাত্র, তখন সেখানে নান্তুদা (জ্যোতিকুমার সরকার) নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রেরণাতেই সেবাদল গড়েছিলেন। বিদেশি শাসনে মানুষের যে বড় কষ্ট তাঁর কাছেই বাবা প্রথম বোঝেন। বোলপুর হাইস্কুল থেকে পাশ করে যখন কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে গেলেন, বাল্যবন্ধু গোপেশ্বর দাস ছাড়াও, ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন, তাঁরা ত্রিধারায় বিভক্ত ছিলেন। পরাধীন দেশের দুঃখ যন্ত্রণায় সকলেই কাতর ছিলেন, কেমন করে দেশের মানুষের কষ্ট ঘুচবে এ বিষয়ে কিন্তু ভিন্ন মত ছিল। একদল বিপ্লবী আগুন ঝরানো পথে চলতেন। তাঁরা মনে করতেন সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশকে স্বাধীন করা যাবে না, বাবার শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এই দলে ছিলেন। তাঁর দলের নাম ছিল যুগান্তর, অত্যাচারী পুলিশকর্তা টেগার্টকে মারতে গিয়ে বিফল হয়ে হস্টেলে এসে বাবার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সেই সূত্র ধরে বাবাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ হয়। বাবা সে দিন বাড়ির এক বিবাহ উপলক্ষে বোলপুরে ছিলেন, তাই তাঁর শাস্তি হয়নি। আর এক দল স্বামী বিবেকানন্দের শিব-জ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, বোলপুরেরই ছেলে দুই ভাই নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধ্যক্ষ) বিমল (স্বামী দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা) ও তাঁদের এক আত্মীয় জীতেন (সন্ন্যাস নেবার পর কী নাম হয়েছিল জানি না) এঁরা ছিলেন এই মতাবলম্বী। এঁরা সবাই বাবার সঙ্গে একই হস্টেলে থাকতেন। এ দিকে ওটেন সাহেবকে মেরে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি থেকে স্কটিশে এলেন। মেডিক্যাল কলেজের সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র ও অনেক ছাত্র কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বাসী। বাবা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাজনীতি নিয়ে যত হাতেলেখা পত্রিকা বের হত, বাবা-ই সে সব লিখতেন। তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ও

পরিষ্কার হওয়ায় ওই ভার তাঁর উপর পড়ে। মত ভিন্ন হলেও এই মানুষগুলির পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। রবিবার হলেই গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য কোথাও যেতেন। এক-মন-প্রাণ এই বোধ বাড়াবার জন্য অনেক পাতা গেঁথে বড় করে একখানা পাতায় গোল হয়ে বসে সকলে একত্রে খেতেন। বাবা বলতেন, "ফেরার পথে সুভাষ গান ধরতেন, তার সঙ্গে আমরাও গলা মেলাতাম। সুভাষের উদাত্ত গলায় সেই সব স্বদেশি গান গঙ্গাবক্ষে ছড়িয়ে যেত। তখন যেন কেমন এক আবেশ আসত, মন পবিত্র হয়ে যেত।"

তার মধ্যে বাবা আবার খেলাধুলাও করতেন। নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও বাবা ব্যাডমিন্টনে অপরাজেয় জুড়ি ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার পর বাবার সঙ্গে চিরদিন যোগাযোগ ছিল।

বি.এ. পাশ করে বাবা এম.এ. ও আইন পড়তে শুরু করলেন। যদিও জাতীয় আন্দোলনে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ে এম.এ. পাশ করা হল না। আইন পাশ করে এলেন। দাদুর নির্দেশে বর্ধমান কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। দাদু ছিলেন সিউড়িতে বর্ধমান রাজের মোক্তার, তাঁর বাসনা ছিল বাবা পরে হাই কোর্টে রাসবিহারী ঘোষের অধীনে হাই কোর্টের উকিল হবেন। বাবার কিন্তু কিছুই ভালো লাগল না। একদিন ঠাকুমার কাছে এসে বললেন, "মা মিথ্যে বলে টাকা রোজগার করতে আমি পারব না, এ সব আমি ছেড়ে দেব।" বর্ধমান থেকে এসে যা দু'দশ টাকা পেতেন সব কুয়োর জলে ফেলে দিতেন। দাদু শুনে রাগ করবেন বলে ঠাকুমা ভয় পেতেন। বাবা বলতেন, "কোনও ভয় নেই মা, মাধবানন্দ দয়ানন্দরা ডাকছে, রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাব।" ঠাকুমার কান্নাকাটিতে দাদু বোলপুর হাইস্কুলে বাবার শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দিলেন। ৭৫ টাকা মাস মাইনে। ৫ টাকা পি.এফ কেটে নিয়ে ৭০ টাকা হাতে পাবেন। শিক্ষকতা নিয়ে বাবা এসে ঠাকুমাকে বললেন, "স্কুলে চাকরি নিলাম, মাইনের অর্ধেক কিন্তু আমার গরিব ছেলেদের বই কিনতে দিতে হবে।" ঠাকুমা তাতেই খুশি।

১৯২০-তে ওকালতি পাশ করে আবাল্যসুহৃদ গোপেশ্বর দাস ও জ্যোতিকুমার সরকারের (নাস্তুদা) সঙ্গে পুরী গিয়েছিলেন সাত দিনের জন্য। সেখানে নেমে শুনলেন গান্ধীজি পুরীতে আসছেন জনসভা ও বক্তৃতা করতে। ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি পুরীতে এলেন— রাস্তায় বিরাট জনতা— স্থানীয় নেতৃত্ব দিচ্ছেন গোপবন্ধু দাশ। গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশের মানুষের সহযোগিতা চাইছেন। সেই জনসভায় গান্ধীজিকে বাবা প্রথম

দেখলেন। সেই প্রথম দর্শন ও তাঁর বাণী মনের মধ্যে জ্বলন্ত হয়ে গাঁথা রইল। গান্ধীজির বক্তৃতার মূল কথা হল, "বিদেশি বর্জন করতে হবে।" তিনি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে যাননি। হিন্দিতে বলেছিলেন, "দেবতাকে বিদেশি বস্ত্র পরিয়ে তোমরা দেবতাকেও পরদেশি বানা দিয়া।"

সেই বছরেই বাবা বোলপুর স্কুলে যোগদান করেন। তাঁর নাস্তুদার ঘরে গান্ধীজির কাগজ 'ইয়ং ইন্ডিয়া' আসত। তাঁর সেই লেখাগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার আহ্বান থাকত। সেই লেখাগুলি এতই মর্মস্পর্শী যে তা বাবার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিত। গান্ধীজির আকুল আবেদনে সাড়া না দিয়ে আর উপায় রইল না। তখন দেশের কোনায় কোনায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, গোপবন্ধু দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অংশগ্রহণ করে একে একে কারাবরণ করলেন।

৭-৮ মাস শিক্ষকতা করার পর বাবা গান্ধীজিকে চিঠি লেখেন যে সবরমতী আশ্রমে তিনি যোগ দিতে চান। তার উত্তরে গান্ধীজি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, "Will you be able to give eight hours' manual labour, will you hesitate to do any manual work or not? You will have to cook your own food if there is no provision for your food in our kitchen. If you agree, you may come at once." বোলপুর স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাবা সবরমতী আশ্রমে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে বাবার বিবাহ হয়েছে সুরুলের ছোট বাড়ির সরকারদের মহেন্দ্রনাথ সরকারের-এর কন্যা পঙ্কজবাসিনীর সঙ্গে। আমার মা তখন পদম্‌কান্দীতে তাঁর মামার বাড়িতে ছিলেন। সেখানে তাঁদের প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিছু দিন আশ্রমে থাকার পর বাবা আমার মায়ের চিঠি পেলেন। মা-ও গান্ধীজির আশ্রমে যেতে চান। তখন বাবা মাকে নিতে ফিরে এলেন। মায়ের সেখানে যাওয়া নিয়ে অনেক বাধা এল। দাদুর প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও মা তৈরি হতে লাগলেন। মায়ের মামারাও এই অদ্ভুত যাত্রা থেকে মাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। স্বামীর পথই তাঁর পথ— এই যুক্তি দিয়ে মা রওনা হলেন। ছোট্ট শিশুটি পথে অসুস্থ হয়ে পড়ল। দুপুর ২-৩টের সময় অসুস্থ হল আর রাত ৮-৯টার সময় মারা গেল। ট্রেনের মধ্যেই যাত্রাপথে এই দুর্ঘটনা ঘটায় মা শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু ছিল না। পরের দিন আমেদাবাদে পৌঁছে সেখান থেকে সবরমতী আশ্রমে গেলেন। আশ্রমে যখন প্রবেশ করলেন, মগনলাল গান্ধী প্রশ্ন করলেন, "Where is your child?" বাবা বললেন, "I lost my child in the way" বাবা ওখানে তাঁতের কাজ শিখতেন। প্রথম তুলো ধোনা, চরকায় সুতো কাটা, শতরঞ্চ বোনা ও সব শেষে কাপড় বোনা, ভালো রকম শিখে

গেলেন। প্রায় ৬ মাস ওখানে থাকাকালীন ওই কাজ নিয়মিত ৮ ঘণ্টা করতেন। মায়ের থাকা-খাওয়ার জন্য খরচ লাগত। স্কুলে কাজ করে যে টাকা জমিয়েছিলেন তাই নিয়ে এসেছিলেন। সে সব যখন ফুরিয়ে এল, প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় বাবা আশ্রমে বললেন, "যে সব কাজ শিখলাম নিজের দেশে গিয়ে সেই কাজ করব।" গান্ধীজি তখন জেলে। মা গান্ধীজিকে দেখতে পাননি। এ দিকে ঠাকুমাও বাবার জন্য আকুল হয়ে লিখতে লাগলেন বাড়ি ফিরে যেতে, বিশেষ করে শিশুকন্যাটি মারা গেছে বলে তিনি কাতর হয়ে আছেন। ফলে বাবা অতি সামান্য পয়সা সম্বল করে কোনওক্রমে দেশে ফিরে এলেন।

অল্প কিছু দিন পরে ১৯২৩-এ উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়। সেই বন্যায় রাস্তাঘাট, লোকেদের বসতি, খেতখামার, শস্য ও অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের দুর্দশার সীমা রইল না। নিঃস্ব অসহায় অবস্থার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে বাবা ছুটে উত্তরবঙ্গে চলে গেলেন। সেখান থেকে গান্ধীজির সেক্রেটারিকে দুর্গতদের ত্রাণের জন্য সাহায্য পাঠাবার আবেদন জানালেন। বাবার চিঠিটি তিনি গুজরাত প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের হাতে তুলে দেন। সেখান থেকে তাঁরা ত্রাণকার্যের জন্য ৫০০ টাকা পাঠান। বাবা উত্তরবঙ্গে গিয়ে প্রথমে চরকা সেন্টার আরম্ভ করলেন। অন্য দিকে একটি বড় রিলিফ কমিটি তৈরি হয়েছে— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার প্রেসিডেন্ট আর সুভাষচন্দ্র সেক্রেটারি। তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাবা ওই ৫০০ টাকা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন যাতে ওই টাকা একই ফান্ড থেকে কাজে লাগানো হয়।

বাবা উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় মাকে নিয়ে বন্যাত্রাণে চলে গেলেন, সেখানে দূর-দূরান্তরে, ত্রাণকার্যে যেতে হবে। বাবার ফাইলেরিয়া ছিল, দীর্ঘদিন জল-কাদায় ওই ভাবে চলতে চলতে সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসা হয়। ডা. সুন্দরীমোহন দাসের সুচিকিৎসায় বাবা সুস্থ হয়ে উঠলেন। সতীশ দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটি অফিসারের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে। তখন খাদি ফেরি করে বিক্রি করতে হত। জীবনের চারটি বৎসর তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। সেই সময় পটলডাঙায় একটি বাড়িতে মা-বাবা সতীশ দাশগুপ্তের পরিবারে তাঁদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে চরকা ও অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে মতবিরোধ ঘটে। বাবার উপর ভার পরে 'সন্ধ্যা' 'সারভেন্ট' ইত্যাদি সংবাদপত্রে গান্ধীজির পক্ষে আলোচনা করার। তাঁর লেখা পড়ে 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক বিশেষ প্রশংসা করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খুশি হয়ে বলেন, "এটা তো নেহাত গাড়োল নয় দেখছি।" সেই সময় সেই সব

ধারাবাহিক লেখাগুলি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খাদি প্রতিষ্ঠানে চার বছর কেটে যাওয়ার পর ঠাকুমার অনুরোধে বাবা বোলপুরে ফিরে আসেন। বোলপুর হাই স্কুলের শিক্ষকের কাজও পুনরায় গ্রহণ করেন। বোলপুর স্কুল লাইব্রেরি ও বোলপুর সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় দুটি লাইব্রেরিকেই তদানীন্তন নানা বিষয়ের মৌলিক আধুনিক পুস্তক সম্ভারে ভরিয়ে তোলেন। সাধারণ পাঠাগারের পাশে একটি খাদি আশ্রমও করেন। দিনের কাজ শেষ করে চরকা কাটা তুলো ধোনা কাপড় বোনার কাজও চলতে থাকে। গান্ধীজির বই, 'হরিজন' পত্রিকা ইত্যাদি পাঠ ও আলোচনাও সেখানে হত। মুষ্টিমেয় হলেও বোলপুরের কিছু মানুষকে তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন। বোলপুর সাধারণ পাঠাগারের প্রাঙ্গণে তিনি বোলপুরের প্রথম সাহিত্যসভাটির আয়োজন করেছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় সভাপতি হয়েছিলেন। আবৃত্তি গান ও পাঠের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময য ডা. আশুতোষ দাস, নির্মলকুমার বসু, সুধীরচন্দ্র লাহা, মলয়কুমার বসু বীরভূম থেকে বোলপুরের ভেতর দিয়ে কাঁথি অভিমুখে চলেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যতগুলি গ্রামে সম্ভব কংগ্রেস এবং সত্যাগ্রহের বাণী পৌঁছে দেওয়া। বোলপুরে এসে তাঁরা শোনেন সবরমতী থেকে ফিরে একজন এখানে খাদির কাজ করছেন এবং গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বাবার সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের ভালো লাগে এবং বোলপুরে থেকে খাদির কাজে যোগদান করেন। খাদি আশ্রমটি পাঠাগারের পাশ থেকে এখন যেখানে জে.এল.আর.ও. অফিস সেখানে উঠে আসে। আশ্রমটির নাম হয় 'খাদিসংঘ'। এই খাদিসংঘই পরে 'গান্ধীস্মৃতি' শিক্ষাগারের রূপ লাভ করে। বাবা ছিলেন শিক্ষাগারের সম্পাদক। তিনি আজীবন এই শিক্ষাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

খাদির কাজ চলতে থাকে। তুলো ধোনা, পাঁজ তৈরি করা, সেই পাঁজ দিয়ে চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে খদ্দর বোনা, এই সব হত। সামনের জমিতে কাপাসের চাষ করা হয়েছিল। সেখান থেকে তুলো আহরণ করা হত। তুলো ছাড়িয়ে বিচি বার করে বোনার জন্য প্রস্তুত করা হত। সেখানে যাঁরা থাকতেন নিজেদের সমস্ত কাজ তাঁরা নিজেরাই করতেন।

"খাদিসংঘকে কেন্দ্র করে একদিকে চলত হরিজন কল্যাণের কাজ ও অন্যদিকে চলত হাটের দিনে মাদকদ্রব্য বিরোধী পিকেটিং। হরিজনদের শিক্ষার জন্য হরিজন পল্লীতে এখন যেখানে রটন্তী কালীতলা সেখানে নিত্য রামায়ণ পাঠ ও আলোচনা হত। এবং তাঁদের রক্ষার জন্য ড্রেন নর্দমা নিজেরা সাফাই করতেন। অস্পৃশ্যতা

বর্জন আন্দোলন তখন বিপুল গতিতে চলছে।" (কবিরাজ সৌরীন্দ্রনারায়ণ সেনের লেখা থেকে উদ্ধৃত)।

সাম্প্রদায়িকতা বর্জনও তাঁদের ব্রত ছিল। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যখন, এমন সময় বোলপুরের জনগণ খাদি সংঘের অফিসে মিটিং করবে বলে সমবেত হয়। বাবা অন্য ঘরে ছিলেন বক্তৃতা উত্তেজনার আওয়াজে এ ঘরে এসে কিছুক্ষণ শুনে দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন, "দেখুন আমি বুঝিনি আপনারা হিন্দু সংগঠনের মিটিং করবেন।" দু'একজন বলে ওঠেন, "তাতে কী হয়েছে?" বাবা চিৎকার করে বললেন, "না, এখানে কোনও সাম্প্রদায়িক মিটিং হতে পারবে না।" হিন্দুর এই দুর্দিনে বাবার আচরণে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে খাদিসংঘ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় কখনও কাছ থেকে কখনও দূর থেকে কখনও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে চিনেছিলেন। তাঁর ভাষায় বলি, *"প্রথম পরিচয় সেবা সমিতির কর্মকালে। নন্‌-কোঅপারেশনের পরে আমরা আমাদের গ্রামে দরিদ্র সেবক সমিতির নাম দিয়ে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল রোগীর সেবা কর্মে সমিতির সকল কর্মী ব্যাপৃত থাকত— কোনও কোনও রোগীর যখন গ্রামে তথা বোলপুরে রোগ নিরাময় হত না, তখন তাদের বর্ধমান কিংবা কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। বোলপুরের কাছারিপটির ছেলেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। এই বোলপুরের ছেলেদের নেতৃত্ব দিতেন হংসদা। আমাদের স্ট্রেচার ছিল না। হংসদা-ই স্ট্রেচার জোগাড় করতেন এবং রোগীকে ট্রেনে তোলা, বসানো এবং যাতে পথে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর সঙ্গে এই সময় পরিচয় হয়। কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলেন না। প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও দিন প্যাঁচ কষাকষির মধ্যে তিনি প্রবেশ করেননি। একদা অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে তাঁকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে। তিন জয়ী হয়েছিলেন এবং নিষ্ঠাভারে দলের আনুগত্য অনুসারে কাজ করেছিলেন।"* তিনি অ্যাসেম্বলির প্রথম অধিবেশনে বলেছিলেন, "দরিদ্র দেশবাসীর ভোটে জয়ী হয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আমরা প্রস্তাব আনলাম আমাদের মাইনে বাড়ানোর জন্য, এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?" এই কথাগুলি কাগজে ছাপা হয়েছিল। শুনেছিলাম কংগ্রেস কতৃপক্ষ তখনই তাঁর উপরে বিরক্ত হয়েছিলেন এবং পরের বারে তাঁকে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। আবার ব্যোমকেশকাকার কথায় ফিরে আসি। "রাজনৈতিক প্যাঁচে তিনি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি টুঁ শব্দটি করেননি। নীরবে এই অসম্মান তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন।" দলের প্রতি

তাঁর আনুগত্য এক তিল ক্ষুণ্ন হয়নি। অজয় মুখোপাধ্যায় যখন বাংলা কংগ্রেস গঠন করেন তখন তাঁকে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের দল ছাড়তে রাজি হননি। মনে-প্রাণে গান্ধীবাদী এই মানুষটি কোনও পদের বা কোনও সম্মানের প্রত্যাশী ছিলেন না। আদর্শের টানে কাজ করতেন। বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। প্রয়াত লীলা রায়ের কাছে শুনেছি তাঁর নিরলস নিরহংকার সঙ্গের কথা।

বোলপুরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সেবা প্রতিষ্ঠান সব কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মন্ত্রী শিক্ষাবিদ জননেতা সকলের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল অপরিমেয়। আবার নগণ্য অখ্যাত দরিদ্র জনগণ তাঁর কাছে অবহেলিত ছিল না। এক দরিদ্র মুসলমান তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন। নিয়মিত তাঁর আগমনে কত খুশি হয়ে উঠতেন বাবা। বাবার শরীর কখনওই ভালো যেত না, তবে মনের জোরের কমতি ছিল না। এক সময় শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য দুমকা যাওয়া হয়। আমি তখন শান্তিনিকেতনে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তখন বোলপুরে মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল না। মেয়েদের পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণি অবধি পড়ানো হত। যেখানে মেয়েদের স্কুল নেই সেখানে ছেলেদের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়া চলত। বাবার আগ্রহে আমি বোলপুর হাই স্কুলে দু'বছর পড়ি। বোলপুর গার্লস স্কুল পরে বাবারই আগ্রহে গড়ে ওঠে। সুধাময়ী দেবীকে অনুরোধ করে বাবা এই বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। অনেক বছর সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় শান্তিনিকেতনে ১৯৩৪ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হই। এই বছরেই তিনি পূজার সময় পাড়ার ও বাড়ির মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটক করান। বোলপুরে মেয়েদের অভিনয় করা অনুষ্ঠান এই প্রথম। দুমকায় মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজ করতে গিয়ে ছুটির পড়া সব শেষ না হওয়ায় বাবা রাগ করে আমাকে আর শান্তিনিকেতনে পাঠালেন না। বললেন, "যে ছুটির পড়া করে না সে লেখাপড়ার অযোগ্য।" আমার লেখাপড়া চুকে গেল। ১৯৩৮ সালে বাবার আবার ক্ষয়রোগ হয়। বাড়িতে এক বছর পূর্ণ বিশ্রামে থাকেন। মনের কষ্ট, দেহের কষ্ট, অর্থ কষ্ট কোনও কিছুতেই বাবাকে মুষড়ে পড়তে দেখিনি। সব কিছুকেই ভগবানের দান বলে গ্রহণ করার শক্তি ছিল। সব সময় শুয়ে থাকতেন, তার মধ্যে লক্ষ করেছিলেন আমি নিজে পড়ি। তাই আবার একদিন বললেন, "তুমি লেখাপড়া করতে চাও তো আবার শুরু করো।" নূতন করে লেখাপড়া করে কোনওক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করলাম ১৯৪০ সালে। বীরভূমের একমাত্র মেয়ে বলে বীরেনদা আমাকে বিনা ফি-তে পড়তে দিয়েছিলেন। এখন বাবা বললেন, "তুমি তো জানো, আমার যা আয় তাতে তুমি ফ্রি

স্টুডেন্টশিপ জোগাড় করতে না পারলে হস্টেলে রেখে পড়ানোর সঙ্গতি আমার নেই।" অনিলকুমার চন্দ থেকে শুরু করে সুরেন কর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও আবেদন করলাম। সুরেনদা বললেন, "অধর রায় এত বড়লোক, তুমি তাঁর নাতনি। তোমাকে বিনা ফি-তে পড়তে দিতে পারি না।" আমি বললাম, "আমি একজন দরিদ্র শিক্ষকের মেয়ে। দাদু যদি জানতে পারেন— আমি এখানে পড়তে এসেছি আমাকে পড়তেই দেবেন না।" প্রকৃত অবস্থা বুঝে বিনা ফি-তে কলেজে পড়তে অনুমতি দিলেন। আমি লুকিয়ে হস্টেলে এলাম। দাদু জানতে পেরে খুব রাগ করে বাবাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। আমরা শান্তিনিকেতনে বাড়ি ভাড়া করে রইলাম। সে সময় মা-বাবাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। কয়েক মাস পরে দাদুর রাগ পড়ে যেতে আবার বাড়ি ফেরা হল।

আমার পড়া নিয়ে বাবা এত কষ্ট করলেন, অথচ আমার পরের বোন বর্ষার বিয়ের সময় বাবা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে বসে রইলেন এবং নীরবে সহ্য করলেন সে গভীর আঘাত। বর্ষা চেয়েছিল গরিব শিক্ষিত বাড়িতে যেতে, কিন্তু দাদু জোর করে জমিদার বাড়িতে তাঁর বিয়ে দিলেন। মা-বোনের এ বিয়েতে খুব আপত্তি ছিল। বর্ষা এ বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু সহ্য করতে পারেনি। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭— একটি চিঠিতে বাবা লিখছেন, "বর্ষার জন্য মুস্কিলে পড়িয়াছি। সে লিখিয়াছে — সে আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্য শুক্রবার তাহাকে আনিতে যাইব। ...কিন্তু তাহারা বলিবে যে আমরা পাঠাইব না। ... পুলিশের সাহায্য কি লইব, না উপবাস করিব? ...ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা ঘটিবেই। তবে মানুষকে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিরাম চেষ্টা না করিলে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।"

বর্ষার জন্য যখন মনের এ রকম অবস্থা, তখন স্কুলেও নানা অশান্তি চলছিল। কোনও এক ঘটনায় বিচলিত হয়ে একখানি চিঠিতে লেখেন, "নূতন হেডমাষ্টার আসিতেছেন, তাঁহাকে স্কুলের বোঝা বুঝাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইতেছে।... মনের মধ্যে জাগিতেছে যেন এই স্কুলের পক্ষে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই— আরও অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি আমার স্থান পূরণ করিতে পারে। ... হয়তো বা কষ্ট আসিতে পারে। ভালও হইতে পারে। ভগবানই তাহা জানেন।" পরের চিঠিতে লিখছেন, "চাকরি কেন ছাড়িতেছি জানি না। মানুষকে কে যেন কার্য করায়, সেইরূপ একটি আদেশ মনের মধ্যে পাইয়াছি।... ভগবান জানেন আমার দ্বারা আর কোন কাজ হইবে কি না।" এর পর চাকরি ছেড়ে দেন। দাদু তখন পরলোকগমন করেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা জমেছিল তাই দিয়ে বোলপুর স্কুলেই অধরচন্দ্র রায় পাঠাগাব

স্থাপন করেন। দাদুর কাছে বাবা আদর্শগত আনুকূল্য পাননি। তাই বলে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' মন্ত্র ভোলেননি। তার পরেই এল বাবার জীবনের কঠিনতম আঘাত। এর পর আর কোনও ঘটনায় বাবাকে এতটা বিচলিত হতে দেখিনি, আর কোনও আঘাত তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বর্ষার মৃত্যুতে বাবা লিখেছিলেন, "মানুষ যখন অতিরিক্ত মায়ার বশবর্তী হয়, ভগবান তখনই একটি প্রিয়জনকে কাড়িয়া এমন একটি কঠিন আঘাত দেন, যাহা মানুষকে খানিকটা সোজা করিয়া দেয়।... ইহাতেও যদি সোজা না হই, তবে তিনি আবার একটি আঘাত হানিবেন। পূজার সময় কয়েকদিন উপবাসে কাটিল, জানি না মনোবল বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। তবে দেখা যায় যখনই মনে কোন অহংকার আসে তখনই তিনি মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদের দর্পচূর্ণ করেন।" সত্যিই আঘাতে আঘাতে এইবার তিনি একেবারেই সোজা— সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। হৃদয় বিকশিত, অভিমান শূন্য, প্রেম পরিপূর্ণ এবং কর্তৃত্ব বোধশূন্য নিষ্কাম কর্মে নিবেদিত। শিক্ষকতা ছাড়লেন। দায়িত্ব এসে পড়ল বিদ্যালয় সম্পাদকের— শিক্ষা সংগঠকের। স্কুলের ভালোমন্দের সঙ্গে তাঁর জীবন জড়িয়ে গেল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জনসেবার কাজগুলির মধ্যে নূতন ভারতের শিক্ষা সংগঠনই তাঁর প্রিয়তর হয়ে উঠল। বোলপুরে যখন কলেজ হল তারও সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ল। । বোলপুর কলেজ-গৃহখানি তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করিয়েছিলেন। ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য ভালো লোক খুঁজছিলেন। বোলপুরেরই সন্তান ড. শচীন মুখোপাধ্যায় (ডি.এস.সি) খুব খেটে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেন। আর ফিজিক্স ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেন ড. রাখহরি বক্সী। যখন কলেজ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, কলেজ অনেক সিমেন্ট পেয়েছে কন্ট্রোলে। তৎকালীন পুলিশ সুপার নিজের বাড়ির জন্য কিছু সিমেন্ট ধার চেয়েছিলেন। বাবা সবিনয় তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ধার হলেই বা কী, কলেজের জন্য যে ইট এসেছে তার একখানিও কাউকে দিতে পারব না।" তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ড. ডি.এম.সেন ও সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন— এত কম টাকায় এত কাজ হল কী করে? নিচুপট্টিতে যে বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে তাতেও তাঁর সহায়তা ছিল। নিজে কমিটিতে যাননি, কিন্তু সবটুকু উদ্যোগ নিয়ে তিনি নিচুপট্টি নীরদবরনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সূচনা করে দিয়েছিলেন।

বাইরের এই কর্মের পথ, তার সঙ্গে সমান্তরাল ছিল ভিতরের ধর্মের পথ। শেষরাতে লন্ঠন জ্বালিয়ে তুলসীদাসের দোঁহার গান গাইতেন, সন্ধ্যায় ছিল বাড়ির সব সন্তানকে নিয়ে প্রার্থনা সভা, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় মুখস্থ বলা হত সমবেত কণ্ঠে,

তারপর বোনেরা গাইত ভজন, রবীন্দ্রসংগীত। বোলপুরের ধর্মস্থানগুলির সঙ্গেও তাঁর যোগ কম ছিল না। মহাপ্রভুর মন্দির— বাবুলাল বল্লভজির দানে আর সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওই মন্দির তৈরি বাবা-ই করিয়েছিলেন। উনি না থাকলে, ও রকম কাজ হত না। রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক যখন হলেন তখন বয়স বেড়ে গেছে, তবু দরজায় দরজায় ভিক্ষায় বেরিয়েছেন মঠ ও বিদ্যার্থী ভবন নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ করতে। নিজে হাজার টাকা দিয়ে তবে তিনি সকলের কাছে গিয়েছেন। তাঁর মত ছিল, নিজে না দিলে অপরের কাছে চাইবার অধিকার জন্মায় না। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন বোলপুরের মঠটি, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। মঠকে তিনি আর্তের সেবাকেন্দ্রও করতে চেয়েছিলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রবি সিংহকে ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন, এবং কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসাও শিখে এলেন। মঠের পাশেই তিনি থাকতেন। সেবাকেন্দ্রটি বেশ কিছু দিন চলেছিল। বাবার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য রামকৃষ্ণ মঠের দায়িত্ব আর যখন নিতে পারছিলেন না, তিনি দায়িত্বমুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শেষে ট্রাস্টি বডি তাঁকে মুক্তি দিলেন।

ষাটের দশকের প্রথম দিকেই অনায়াসে বোলপুর বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়েছেন। যোগ ছিল কেবল বেড়গ্রাম পল্লিসেবা নিকেতনের সঙ্গে। আলবাঁধা উচ্চ বুনিয়াদির রূপায়ণেও তাঁর চেষ্টা ছিল। তা-ও সমাপ্ত করেছেন।

শেষকালে সব কিছু থেকে অবসর নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের মধ্যে। নিজেকে তৈরি করছিলেন শেষ বিদায়ের জন্য। বার্ধক্যের ভারে তাঁর শরীর অশক্ত হয়ে আসছিল। কিন্তু চিন্তার স্বচ্ছতা ও মুক্ত দৃষ্টির অভাব কোনও দিন হয়নি। কোথাও কারও একটা ভালো খবর পেলে আনন্দ করে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখতেন। শোকের খবর পেলে যে মন্ত্রে শোক জয় করা যায় তার আভাস দিতেন। বলতেন, "কিছুই যায় না, তাঁর চরণে সবাই থাকে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই তো তাঁর। জীবন সে তো চিরসুন্দরেরই প্রকাশ। সব কিছু তাঁর চরণে অর্পণ করেই আনন্দ।" পাড়ার ছোট ছোট শিশু-কিশোররা তাঁর এই সময়ের সঙ্গী ছিল। তাদের সঙ্গে চলত অঙ্কের খেলা। তাঁর এই সময়ের ডায়েরিগুলিতে পাতায় পাতায় কষা আছে পঞ্চম শ্রেণির সরল থেকে কলেজের ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত পর্যন্ত। বাকি সময় কাটত অধ্যয়নে। কত বইয়ের যে খোঁজ করতেন, শুধু বই বই আর বই। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত— সব ভাষার বইয়ের তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন। এই সময়ের ডায়েরিগুলি মূল্যবান উদ্ধৃতিতে ভরা। কবির তুলসীদাস থেকে এমার্সন

হুইটম্যান, গান্ধী বিনোবা থেকে মাও সে তুং পর্যন্ত কত মূল্যবান উদ্ধৃতি সংগ্রহ— এ যেন শেষযাত্রার পাথেয়।

প্রয়াণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা ছিল সুস্পষ্ট। দিন আসন্ন— তখন তার জানা হয়ে গেছে। আমাকে বললেন, "আমাকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। এই বোলপুরেই আমাকে রাখিস তোরা।" মাকে বলেছিলেন, "সাদা খদ্দরের চাদরে শুইয়ে দিয়ো, কপালে হরিনাম লিখে দিয়ো, মুখে তুলসীপাতা দিয়ো। খাট পালঙ্কে যেন নিয়ো না। নতুন বাঁশে নিয়ো। যখন ওরা মাটিতে নামাবে, সেই বোলপুরের স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, শিক্ষাগার, বালিকা বিদ্যালয়— সেই সব জায়গার ধুলো আমার মাথায় মাখিয়ে দিয়ো।" শেষ দিনে সমস্ত বোলপুরের মানুষের পায়ের ধুলো মাথায় মেখে ছোট-বড় সকলকে শেষ প্রণাম জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। আর আমি তখন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখলাম— আশ্চর্য এক রৌদ্রভরা দিন। ঝকঝক করছে নীল আকাশ। তারই মাঝখানে সাদা ধবধবে ডানা মেলে উড়ে চলেছে রাজহংস— দূরে বহু দূরে অসীম মহাশূন্যে।

মা জননী পঙ্কজবাসিনী

আমার মা সুরুলের ছোটবাড়ির মেয়ে ছিলেন। সরস্বতী পুজোর দিন জন্ম হয়েছিল। তাই তাঁর ঠাকুমা নাম দিয়েছিলেন পঙ্কজবাসিনী। লেখাপড়ায় খুব মন ছিল, গ্রামের পাঠশালার শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে মস্ত এক পুরস্কার পেয়েছিলেন। গ্রামে আর লেখাপড়ার কোনও উপায় নেই, মনে ভারী দুঃখ হয়। তখন শ্রীনিকেতন কুঠিবাড়িতে মীরাদি আর নগেন গাঙ্গুলী মশাই থাকতেন। অনেক ভেবে একদিন কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে দল বেঁধে মীরাদির কাছে গিয়ে বললেন, পাঠশালার পড়া শেষ হলে গ্রামের মেয়েরা আরও যাতে পড়তে পারে তার জন্য স্কুল দরকার। যে করে হোক সে কাজ করে দিতেই হবে, আমি হয়তো তখন পড়তে পাব না, কিন্তু আমার মতো অনেকে তো পড়তে পারবে। ছোট্ট সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটিকে মীরাদি সেদিন আশ্বাস দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনে মেয়েদের স্কুল হতে তারও পরে অনেক সময় লেগেছিল। মেয়েদের উন্নতিকল্পে আমার মায়ের যে আজীবন প্রয়াস, তা সে দিন এভাবেই শুরু হয়।

মা আমার অতি শৈশবে মাতৃহারা হন, বীরভূমের সীমানা থেকে এক পা এগিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পদম্‌কান্দি গ্রাম। সেখানে মায়ের মামার বাড়ি। মায়ের দিদিমা

একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে তাঁর শিশুটিকেই কোলে তুলে নিলেন। একটু বড় হতে মায়ের বড় জ্যাঠাইমা তাঁকে নিয়ে এলেন। তাঁর কন্যাসন্তানের সাধ আমার মাকে দিয়ে পূরণ হল। দিদিমা ও মায়ের বড়মা তাঁকে অগাধ ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তোলেন। মায়ের বাবা পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। একটি কন্যা ও তিনটি পুত্রও হয়েছিল। কিন্তু প্রথম সন্তানটিকে তিনি সবার উপরে ঠাঁই দিয়েছিলেন। দাদামশাইয়ের সাত ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবারে এই মাতৃহারা শিশুটি সবাইকার আদরের ধন আর সকলের আপনজন হয়ে বেড়ে ওঠেন। পরে যখন সাত ভাইয়ের সাত ঘর হয়, মায়ের আমার তাঁর জ্যাঠাইমা কাকিমার সব ঘরেই সমান অধিকার। আমাদের আপন দিদিমা আর মায়ের দাদা-দিদি ভাই-বোনেদের সকলের তিনি একান্ত আদরের।

আমার দাদু পরে যাঁকে ঘরনি করে আনেন, তাঁর উপর নির্দেশ ছিল, সংসারের সব সেরা জিনিস সবার আগে যেন তাঁর মা-হারা মেয়েটি পায়। মেয়ে বড় হতে থাকে, দাদুর চিন্তা হয় কোথায় তার বিয়ে দেবেন। কাছে দূরে, দূরান্তর থেকেও কত বড় বড় ঘরের ছেলের সন্ধান আসে। দাদুর চোখে কোনও ছেলেকেই তাঁর মেয়ের যোগ্য মনে হয় না। বনেদি জমিদারবাড়ির সুন্দরী মেয়ে। আত্মীয়-পরিজনরা রকমারি সম্বন্ধ আনে। দাদু কোনও না কোনও অছিলায় সব বিবাহ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। শেষে ঘরের পাশে বোলপুরে এক ছেলের খোঁজ পান। খোঁজখবর নিয়ে ছেলেকে দেখতে আসেন দাদু। তখন তাঁদের উপযুক্ত ঘর আমাদের ছিল না। তবু তাঁর মন এখানেই টানছিল। আমার বাবা যখন খালি গায়ে কোঁচার খুঁটটি জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সুদেহী সেই তরুণের সরল স্বভাবের মাধুর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই দিনই বিয়ের ঠিক করেছিলেন। মায়ের বিয়ের পর আমার দাদু মাত্র এক বছর বেঁচেছিলেন। তারই মধ্যে আমার মায়ের নামে ১০ বিঘে ধানের জমি আর বল্লভপুরে ধানতোলা-গোরু বাঁধার জন্য একখণ্ড জায়গা লিখে দিয়েছিলেন। পিতৃদত্ত সেই ধন আমার মায়ের আজীবন আত্মনির্ভরতার উৎস ছিল।

বিয়ের পরে সকলের আদরিণী নয়নের মণি মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েই বুঝলেন এ এক ভিন্ন জগৎ। নতুন এক অজানা অচেনা পরিবেশে এসে সব মেয়েরেই অল্পবিস্তর এই অনুভূতি ঘটে। এখানে পদে পদে বিচার আর সমালোচনা! কবির কথায় "ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।" কনে-বৌয়ের রূপ বা আভরণের কোনও অভাব ছিল না। কিছু বলার না পেয়ে মেয়েরা সবাই মিলে তখন অহৈতুকী এটা-ওটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকলেন। আর চোখের জলে ভেসে মাকে প্রমাণ দিতে হল যে তিনি অরক্ষণীয়া নন। আমাব

ঠাকুরদাদার তিন ভাই দুই বোন। তাঁদের সকলের ছেলে-মেয়ে, ঠাকুমার বাপের বাড়ির মানুষজন আর পাড়া-প্রতিবেশী সব নিয়ে বাড়ি পরিপূর্ণ, নানাজনের নানা কথা শুনতে শুনতে নববধূ যখন দিশেহারা, তখন আমার ঠাকুমার স্নেহামাখা দৃষ্টি দেখে তিনি যেন কূল পেলেন।

ঠাকুমার এই ছেলেটি আর পাঁচজনের মতো নয়। তার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কেউ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। কেউ বা বিপ্লবের পথে নির্ভয়ে দেশমাতৃকার পায়ে জীবন সঁপে দিয়েছে। নিজে পরাধীন দেশের মানুষের বেদনায় কাতর, গরিব দুঃখী আর্তজনের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। বিয়ে সে কিছুতেই করতে চায়নি, মায়ের অনেক কান্নাকাটি ও বহু অনুরোধে রাজি হয়ে বলেছিল, ''যে আসবে তাকে আমার পথে চলতে দিতে হবে, আর প্রয়োজনে আমার সঙ্গে ঘরের বাইরে সে যাবে।'' ঠাকুমা ছেলে বিয়ে করেছে এতেই কৃতার্থ! মাতৃহারা ছোট মেয়েটির প্রতি করুণা, যদি ছেলে গৃহমুখী হয়। তাকে পরম স্নেহে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন।

স্বামীর সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় যখন পার হতে লাগল, বধূটি তাঁর গভীর অনুভূতি ও সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেন— জানাচেনা সকল মেয়েদের থেকে জীবন তাঁর ভিন্ন খাতে বইবে। মহার্ঘ ভূষণ রেশমি বসন আর বিদেশি সুগন্ধে সুবাসিত সাজসজ্জার যে রীতি মেয়েমহলে প্রচলিত, দয়িতের চোখে নিজেকে সুন্দরতর করে তোলার যে বাসনা প্রতিটি মেয়ের মজ্জাগত, তা তাঁর কোনও কাজেই লাগবে না। যে মানুষটির সঙ্গে তাঁর জীবন যুক্ত হয়েছে তাঁর স্বপ্ন কল্পনা আর আদর্শকে নিজের করে নেওয়ার ইচ্ছেটাই বড় হয়ে উঠল। আমরা যখন কিছুটা বড় হয়ে উঠেছি, বাবা বলতেন, ''তোর মা যখন বিয়ের পরপর ঘরে আসত কী সব মাখত। দূর থেকেই বয়ে আনত সুবাস। ঘরে এলে ঘর ভরে যেত সুগন্ধে। আমার পাল্লায় পড়ে বেচারির সব ঘুচে গেল।'' সেই সব ঘুচে যাওয়াতে মায়ের মুখে কোনও দিন কোনও দুঃখের আভাস মেলেনি।

মা তখন আকস্মিক পিতৃবিয়োগে শোকাতুর। ছোট ভাইবোনগুলির চিন্তায় আকুল হয়ে আছেন। তার সঙ্গে নিজেও মা হতে চলেছেন। সবচেয়ে আপনার জনকে পাশে পেতে তার উপর নির্ভর করতে যখন প্রাণ উন্মুখ, সেই সময় এল বিচ্ছেদের বার্তা, বাবা সবরমতী আশ্রমে যাওয়া মনস্থ করেছেন। সাধারণ মেয়ের মতো ভেঙে পড়লে তো তাঁর চলবে না, দুজনের জীবনের পথ যে এক হয়ে গেছে। স্থির হল, মায়ের সময় হলে বাবা এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন।

সবরমতী আশ্রমে প্রায় এক বছর থেকে গান্ধীজির কাছে বাবা অনুমতি চাইলেন মাকে নিয়ে যাওয়ার, গান্ধীজির সম্মতি পাওয়ার পর বাড়িতে জানালেন যে তিনি মাকে নিতে আসছেন। এত দিন পর নিজের মানুষটিকে কাছে পাবেন। তাঁর কোলে তুলে দেবেন অতি আদরের শিশুটিকে, সেই আনন্দে জলভরা চোখে দিন গুনছেন। এমন সময় তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন উঠল নিন্দার, ব্যঙ্গ-পরিহাসের সীমা রইল না। বাড়িতে আমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঠাকুরদা। রাজপুরুষদের সঙ্গে যাঁর নিত্য যোগ। নিজের ছেলেকে নিজের মতে না আনতে পেরে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। ছেলে দামি সরকারি চাকরি ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আইন ব্যবসা করতে গিয়েও ছেড়ে চলে এসেছে। স্বদেশি আন্দোলন করতে রাজবিরোধী গান্ধীর আশ্রমে যোগ দিয়েছেন, ক্রোধে ও বেদনায় এ সব তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন। আজ যখন তাঁর বেপরোয়া ছেলে ঘরের বৌকে দূর বিদেশে আত্মীয়-পরিজনহীন এক অচেনা অজানা পরিবেশে নিয়ে যেতে চাইল, মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। বধূটিকে প্রতিদিন নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু বকে, ভয় দেখিয়ে, কখনও-বা প্রলোভন দেখিয়েও তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না। শান্ত হয়ে মাথা নিচু করে সব কিছু শুনে যায়। নিজের প্রতিজ্ঞায় সে অটল থাকে।

মায়ের মামাবাড়ি পদম্‌কান্দী থেকে ছুটে আসেন মামারা, তাঁদের মা, গ্রামের সকলের রানি মা চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। কোন এক দূরে প্রবাসে সর্বহারা হয়ে অদ্ভুত এক জীবনে তাদের মেয়ে ভেসে যাবে এ তাঁরা কিছুতে সহ্য করতে পারবেন না। সুরুল থেকে মায়ের জ্যাঠামশাই, কাকারা, বড়দাদা-দিদিরা জনে জনে এসে তাঁদের আদরিণী মেয়েটিকে নানা অজানা আশঙ্কায় এই সৃষ্টিছাড়া যাত্রা থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন। অতি যত্নে সকল শুভার্থী আত্মজনের আবেদন নিবেদন তাঁকে হাসিমুখে নীরবে ফিরিয়ে দিতে হয়। সেই মেয়েটি অন্তরের অন্তস্তলে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে প্রিয়-প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে রয়েছেন। মনের গভীরে আপনজনটিকে ঠিকই চিনে নিয়েছেন। সবাই যখন মাকে যেতে মানা করছেন, একজন গোপনে সদাই তাঁকে সাহস জোগাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি আমার ঠাকুমা। ঠাকুমার চিন্তা ছেলে ফিরে এসে বৌকে নিয়ে গেলে কোনও দিন ফিরে আসার আশা থাকবে। একা সেখানে থেকে গেলে যদি সে মা-বাবা ঘর-সংসার সব ভুলে যায়, তবে তিনিও তাঁকে হারাবেন। বাবা এলেন, স্কুলের শিক্ষকতায় সামান্য অর্থ তাঁর সঞ্চয় ছিল, সেটুকু তুলে নিলেন। ঠাকুমা সকলের অজান্তে তাঁর নিজস্ব কিছু টাকা-পয়সা ছেলের হাতে দিলেন। আশ্রমে বাবার পরিশ্রমের টাকায় তাঁর নিজের খরচ চলবে, কিন্তু মায়ের জন্য দৈনন্দিন খাওয়া-থাকার অর্থের প্রয়োজন, কারণ আশ্রমের তাই রীতি।

বাবাকেও নানাজনে এই যাত্রা থেকে বিরত হতে বললেন। বিশেষত তখন চৈত্রমাস যে কোনও যাত্রার পক্ষে অশুভ সময়। নানা দিক থেকে প্রবল বাধা এল। তবু নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে পৌঁছতে হবে, কল্যাণকর্মে যাত্রার সর্বক্ষণই শুভক্ষণ, এই বলে বাবা তাঁর সংকল্পে অবিচল রইলেন। সব আয়োজন সারা হলে, যাওয়ার দিনে লালপাড় সাদা খদ্দরের শাড়ি আর শাঁখা সিঁদুরে সেজে, নিরাভরণা মা-আমার কোলে ফুলের মতো ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। সে-দিনকার সেই ছোট্ট বোলপুর স্টেশন মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে, কল্যাণকর্মে ব্রতী এক দম্পতি চলেছেন তীর্থপথে। উৎসাহী তরুণ বন্ধুরা ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে, "শুভ হোক তোমাদের যাত্রা, সার্থক হয়ে ফিরে এসো আমাদের মাধ্যে।"

বাংলা বিহার ছাড়িয়ে যত অগ্রসর হয় গাড়ি, পশ্চিমের গ্রীষ্মের দাবদাহের প্রখর তাপে যাত্রীরা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণায়মান অগ্নিসম দারুণ লু যখন বইতে লাগল, মা-বাবা দেখলেন তাঁদের ফুলের মতো শিশুটি শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। দিল্লি থেকে মেয়ের দাস্ত শুরু হল। তখন দুপুরবেলা, রাত ৮টায় তার শেষনিশ্বাস পড়ল। বহু আকাঙিক্ষত সবরমতীর পথে প্রথম সন্তানকে দেশের স্বাধীনতাযজ্ঞে আহুতি দিয়ে মা আমার সেই আশ্রমে পা রাখলেন।

এত দিন পরে সংকল্প যখন পূরণ হল, শোকে তখন তিনি স্তব্ধ। মা নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে একেবারে একা। বাবা চলে যান তাঁর প্রাত্যহিক নানাবিধ কর্তব্য করতে। শূন্য কোল, তবু যে নেই তার জন্য অমৃতে ভরা বুক নিয়ে মা শুধু কাঁদেন আর কাঁদেন। ছোট কচি হাত দুটি সদাই যেন তাঁকে আঁকড়ে ধরে আছে। তার পাওনা সব সুধা আজ বৃথাই ঝরে পড়ে যায়। আশ্রমজননী কস্তুরবা যখন শোনেন 'বাঙালিবেন' ঘরে অশ্রুভরা বেদনায় শোকে মগ্ন, তখন তিনি সকল আশ্রম-মাতাদের শিশুদের নিয়ে মায়ের কোলে তুলে দিলেন। গুজরাতি ভাষা মা বোঝেন না, এটুকু বোঝেন নিজেরটি হারালেও বহুর মা তাঁকে হতে হবে, আশ্রমজননীর তাই নির্দেশ। অন্য মায়েরা যখন নানা কাজে ব্যাপৃত থাকেন— আশ্রমের সকলের রান্না, নদীর জল তুলে নিয়ে আসা, ঘাটে বসে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মা তখন ঘাটের পাশে ছায়াঘেরা এক গাছের তলায় শিশুদের খেলা দুষ্টুমি কান্না-হাসি-আদর নিয়ে কোনও একটা মুহূর্তও ফাঁক পান না। ধীরে ধীরে গুজরাতি ভাষা ভাঙা ভাঙা বলতে পারেন। তার মধ্যেই সময় করে হিন্দি পড়তে শেখেন। তখন থেকে হিন্দি ভাষার চর্চা তিনি আজীবন করে গেছেন। তুলসীদাসী রামায়ণ নিত্য পাঠ্য ছিল, হিন্দি পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত পড়তেন।

আশ্রমজীবনে যখন আত্মস্থ হতে পেরেছেন, তখন শিখেছেন অনেক কিছু, তুলো ধোনা, তাই থেকে আঁজ তৈরি, চরকায় সুতো কাটা, সেই সুতো দিয়ে তাঁতে শাড়ি বোনা। নিজের কাজ শেষ হলে দেখেন মায়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে বিশ্রামে গেছেন। তাদের নানাবিধ কাজ যা পড়ে থাকে সেগুলি খুঁজে খুঁজে করে রাখেন। জননী কস্তুরবাকে যত দেখেন ততই তাঁকে ভালো লাগে আর তাঁর গভীর স্নেহে ধন্য হয়ে যান। মা আশ্রমে আসার আগেই গান্ধীজি জেলে যান তাই মা তাঁকে তখন দেখতে পাননি। তিনি না থাকলেও 'বা' হাল ধরে বসে আছেন, কোথাও কোনও ছন্দ পতন নেই। এ দিকে বাবা দেখলেন মায়ের জন্য আশ্রমকে দেয় যে অর্থ এনেছিলেন তার সামান্যই আর বাকি আছে। তখন আশ্রম পরিচালক মগনলাল গান্ধীও বাবাকে জানালেন, "আশ্রমের কাজ যেটুকু শিখলেন— এখন নিজের দেশে ফিরে গিয়ে এ সব কাজ করবেন আর গান্ধীজির বাণী প্রচার করবেন।" সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হলেন। বাড়ি ফিরে যাবেন জেনে মায়ের যেমন ভালো লাগল, তেমনই আবার এমন সুন্দর পরিবেশ থেকে শূন্য কোলে ফিরে যেতে হবে জেনে বিষাদে ভরে রইল মন। কস্তুববাকে প্রণাম করে সকলের কাছে জলভরা চোখে বিদায় নিলেন।

টিকিট কাটার পর হাতে কয়েকটা মাত্র টাকা রইল। মায়ের একান্ত বাসনা, যাওয়ার পথে পুষ্করতীর্থ ঘুরে যাবেন। ছোট থেকে শুনেছেন সেখানে সাবিত্রী পাহাড়ে উঠে দুজনে মিলে দেবীকে পুজো দিলে চির এয়োস্ত্রী থাকবেন। ভালো করে পুষ্করতীর্থ ঘুরে প্রায় অর্থশূন্য অবস্থায় হরিদ্বারে গেলেন। গঙ্গার পবিত্র স্বচ্ছ নির্মল নীল ধারায় অবগাহন করে মন তাঁদের শান্তিতে ভরে গেল। সন্ধ্যায় সুরধনীর জলে বহু দীপশিখার আরতি। শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি আর সংস্কৃত মন্ত্রের স্তবগান শোনার আনন্দ ভোলার নয়। শেষে সেই প্রদীপগুলির স্রোতের ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাওয়া দেখে দেখে আশ যেন মেটে না। উঠেছিলেন এক ধর্মশালায়, সেখানে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বললেন, "এখানে এসে লছমনঝুলা-হৃষীকেশ না গেলে আসাই বৃথা হবে।" পরদিন সকালে টাঙায় গেলেন নতুন তীর্থ দেখার উদ্দেশ্যে। গঙ্গার কূল ধরে পথ চলেছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চড়াই উতরাই বেয়ে বেয়ে, চারিদিকে সবুজ বনানী। লছমনঝুলার ঝুলনসেতুর আগে টাঙা দাঁড় করিয়ে সেতু পার হয়ে লছমনঝুলা ও হৃষিকেশ দর্শন করে তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। অনেক পথ ঘোরা হল। টাঙাওয়ালাকে তাঁদের কাছে অবশিষ্ট যা পয়সা ছিল দিয়ে বাবা বললেন, "ভাই, আমরা গান্ধীজির আশ্রম সবরমতী থেকে ফিরছি। আর পয়সা দিতে পারব না, মাত্র দু'খানি খদ্দরের শাড়ি আছে তুমি খুশি হয়ে যদি একটি নাও তবে আমাদের তীর্থে ঘোরা সার্থক হবে।" টাঙাওলা শুনে কিছুহ

নিতে চায় না। বারবার বলে ক্রান্তিকারীদের সে নিজের দেশ ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তাতেই তার পুণ্য হয়েছে। সব পাওনা তার পাওয়া হয়েছে। অনেক অনুরোধের পর শাড়িখানি মাথায় নিয়ে বলেছিল "মায়ী, তোমার এই শাড়ির মতো দামি কিছু কোনওদিন পাইনি, তোমাদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

এই গল্প মা যখন আমাদের বলতেন, বিত্তহীন পুণ্যহৃদয় সেই মানুষটিকে স্মরণ করে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে যেত। এবার মন গৃহমুখী। দু'দিনের যাত্রা, অনাহারে থেকে দীর্ঘপথ পার হয়ে ফিরে এলেন দেশে।

ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে এল সবাই খুশি। ঠাকুমার আনন্দ ধরে না। বাড়ির সবাইকারই মন হারানো শিশুটির জন্য কাতর হয়ে রইল। মা আমার আগের মতোই মাথায় ঘোমটা টেনে সারা দিনের সকল কাজ একমনে করে যেতে লাগলেন। সেই ছোট্ট শিশুটি— যাকে হারিয়ে আবার অনেকগুলি কচিমুখ দেখে তাদের নেড়েচেড়ে আশ্রমের দিনগুলি কেটেছিল, মনের মাঝে তারা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভুলতে চাইলেও ভোলার জো-টি নেই।

বাবা ফিরে গেলেন শিক্ষকতায়। বোলপুর সাধারণ পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান হলেন, ওই পাঠাগারের পিছনে একটি খাদি আশ্রম করলেন। অত দূরে মা আর যেতে পারতেন না। স্কুল পাঠাগার, খাদি আশ্রম, দেশে গান্ধীজির বাণী ছড়িয়ে দেওয়া যত দুঃস্থ পীড়িতদের সেবায় বাবার দিন কাটে। কেবল গভীর রাতে দেখা হয় মায়ের সঙ্গে। বাবার কাছে তাঁর সকল কাজের বিবরণ শোনেন, তাতেই তৃপ্তি। নিজে এ সব কাজে যোগ দিতে না পারলেও মনে মনে বাবার সঙ্গেই থাকেন। এমনি করে দিন কেটেছে, রাত কেটেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে থাকলেও, সকল কাজে বিরক্তি না থাকলেও, কোথায় যেন একটা অমিল থেকেই যায়!

কোনও এক সময় উত্তরবঙ্গে বন্যার মহাপ্লাবনে এক চরম সংকট উপস্থিত হয়। বাবা মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন। ত্রাণকাজে যোগ দেবেন বলে মাকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করেন। উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতি, ভারত-সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন এঁরাই যথাসাধ্য ত্রাণকার্য করে চলেছিলেন। বাবা দূরে দূরে জল কাদা ভেঙে পায়ে হেঁটে, কোথাও বা নৌকো করে জলবন্দি মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনতে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন শুকনো খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় জল ও ওষুধ। ফিরে আসতেন গভীর রাতে, কখনও বা ফিরতেই পারতেন না। মা একা একা ঘরের কাজ সেরে আশেপাশের গরিব মানুষদের ঘরে গিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে চাইতেন। নিজের সামান্য ক্ষমতায় যেটুকু সাধ্য তাদের অভাব ঘোচাতে চাইতেন। বেশির ভাগই তাঁরা মুসলমান। বোলপুরে

কোনও মুসলমান বাড়ির অন্দরে যাওয়ার কথা মা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, যে কালে যে সমাজে ও পরিবেশে বড় হয়েছেন। হয়তো মুসলমান নারী-পুরুষ কখনও দেখেছেন অনেক দূর থেকে। কাছাকাছি যাওয়া কোনও দিনও ঘটেনি। সবরমতীতে কিছু প্রতিজ্ঞা নিতে হয়েছিল— যার মধ্যে অন্যতম সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা নির্মূল করা। বাড়ি থেকে দূরে আসার ফলেই একদিন একা মুসলমান বাড়ির ভেতরে পৌঁছে গেলেন। তাঁর আশ্চর্য লেগেছিল, সেই অন্তঃপুরে সবাই তাঁকে আপন করে নিল। কোথাকার কোন দূরের মানুষকে নিজেদের গভীর দুঃখ-দুর্দশার কথা তারা উজাড় করে দিয়েছিল। মানুষের এত দুঃখ তিনি কোনও দিন দেখেননি। অতি রক্ষণশীল সমাজের তৃণমূলে যে গভীর দারিদ্র্য ও অসহনীয় কষ্ট, তা দেখে ও শুনে তাঁর মন ব্যথায় টনটন করে উঠল। মহরম বেওয়া নামে এক অসহায় বৃদ্ধা, যত দিন মা ওখানে ছিলেন মায়ের দরজার কাছে শুয়ে থাকত। তাকে খাওয়ানো, তার সেবা করা, তার সব অভাব মেটানো মায়ের নিত্যকর্ম ছিল। খাবার পরেই সে আবার খেতে চাইত যাকে বলে দৃষ্টিখিদে। (এর অনেক পরে আমার ছোটবেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে যখন ভুগতাম, জ্বর থেকে উঠেই খাই খাই করে জ্বালিয়ে মারতাম। মা বলতেন, "মেয়ে মেয়ে করে যখন কাঁদছিলাম, মহরম বেওয়া বড় ভালোবেসেছিল।" সে-ই আমার কাছে ফিরে এল। মহরম বেওয়ার কথা বলতে বলতে মা সেখানকার কত রোকেয়া মেসিনার জীবনের করুণ কথা আমাদের শোনাতেন) জলে কাদায় ঘুরে ঘুরে ও নানা অনিয়মে ৪-৫ মাস পরে বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উত্তরবঙ্গ থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। অসুস্থ অবস্থায় ভালো চিকিৎসার জন্য বাবাকে কলকাতায় আনা হয়। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে বাড়ি ফিরে আসেন। কত কাল পরে যখন দেশভাগ হয়ে গেছে, পূর্ববঙ্গের এক জমিদারবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তাঁরা দুঃখ করে বলেছিলেন, "স্বাধীনতার জন্য পূর্ববঙ্গের মানুষরা কত বিপ্লবী হয়ে প্রাণ দিল, দ্বীপান্তরে গিয়ে কত দুঃখ যন্ত্রণা পেল। স্বাধীনতার আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিয়ে কত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করল। আর আজ তারাই নিজের দেশ, ভিটেমাটি ছেড়ে, সব কিছু ফেলে চলে আসতে বাধ্য হল পরবাসে, মা বললেন, "সত্যি তোমাদের দুঃখের কোনও সীমা নেই, তবু দোষ আমাদের হিন্দুদেরই হয়েছে, গরিব মুসলমানদের ঠিকমতো দেখা হয়নি। তাদের বড় কষ্ট একদিন আমি দেখে এসেছিলাম। হিন্দুরা যদি সে সময় তাদের ঠিকমতো সহায়তা দিতেন, তাদের দুঃখ-বেদনার শরিক হতেন, তবে আজ ধর্মের নামে তাদের খেপিয়ে তোলা যেত না। সেই সব মানুষেরা নানা

অন্যায় অত্যাচারেই মুসলিম লিগের ফাঁদে পা দিয়েছে। সে দিন কোলে টেনে নিলে আজ তারা কখনও আমাদের পর করে দিত না।" মায়ের এই আন্তরিক চিন্তাধারা খুবই সত্যি বলে মনে হয়েছিল। দেশে ফিরে এসে বাবা খাদি প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটি অফিসারের কাজ নিলেন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আর তাঁর ভাই ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সপরিবার পটলডাঙায় থাকতেন। বাবা-মাকে তাঁরা নিজেদের পরিবারের অংশ করে নিলেন! এখানে এসে ওই ত্যাগব্রতী পরিবারে মা অতি আপনজনের মতোই মিশে গেলেন। ঘর-সংসারের কাজ, চরকা কাটা, খদ্দর বোনার কাজে মায়ের দিন কাটত। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য যাঁরা এক হয়েছিলেন, এমন ছোট-বড় বহু মানুষের সে বাড়িতে আনাগোনা ছিল। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন সেবাযত্নে মন-প্রাণ ঢেলে নিজেকে মা উজাড় করে দিলেন। নানা মহিলা-সভা, শোভাযাত্রা বস্তির মেয়েদের চরকা কাটা শেখানো, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলা, গান্ধীজির আন্দোলনের কথা বোঝানো, এই সবই দাশগুপ্তবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে মা করতেন। প্রতিদিনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে গ্লানিহীন এক আনন্দময় জীবনযাপনের ওই অধ্যায়ও শেষ হল একদিন। তিন-চার বছর সেখানে কাটিয়ে শারীরিক-অসুস্থতার জন্যই বাবাকে বাড়িতে ফিরে আসতে হল, মাও ফিরে এলেন গৃহকোণে।

বাড়িতে এত মানুষ, তবু মার যেন কেমন একা লাগে। শূন্য কোল আজও ভরল না। এত দিন ধরে কত কী শিখলেন। বহু আনন্দ-বেদনা হাসি অশ্রুর সঙ্গে পরিচয় ঘটল, কত পর আপন হল। কত মেয়ের কত বিচিত্র জীবন-যন্ত্রণা তাঁকে কাঁদাল। আজ ঘরে এসে বাইরের সব সঞ্চয় মনের ভেতর জমিয়ে রেখে হারানো ধনটি ফিরে পাবার এক আকুল আর্তি তাঁকে পেয়ে বসল। সুরুলে যান আপনজনদের দেখতে, সকলের খোঁজ নিতে আর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়ের কালীমায়ের কাছে প্রণাম করে সন্তান ফিরে পাওয়ার বাসনায় আবারও মা হতে।

তখন শ্রীনিকেতনে শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষের পত্নী মনোরমা দেবী ও ননীবালা দেবীর সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁদের সঙ্গে ছোটবোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ননীবালা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মা তাঁর কাছে গিয়ে গিয়ে সে বিষয়ে শিক্ষা নেন। সে যুগে মা হতে গিয়ে অনেক মেয়েরই জীবন শেষ হয়ে যেত। শিশুমৃত্যুর হারও ছিল অনেক বেশি। মায়ের নিজের মা তাঁর ভাইকে প্রসব করতে গিয়ে ধনুষ্টংকার হয়ে মারা যান— শিশুটিরও মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়বার মা হওয়ার আগেই মা চাইলেন বিষয়টা ভালোভাবে জেনে নিতে। বাংলায় সে কালে যে ক'টি ধাত্রীবিদ্যার বই পাওয়া যেত সব সংগ্রহ করে মন দিয়ে

পড়ে নিলেন বারবাব। চিরকাল সেগুলি অতি যত্নে রাখতেন। প্রসূতি পরিচর্যা, শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, তাদের পুষ্টির উপায়, আপন মনের তাগিদে গভীর নিষ্ঠাভরে আয়ত্ত করে নিলেন। পুরোনো দিনের ধাই মা'রা আবহমান কাল ধরে যাঁরা পরম্পরাগত ভাবে এ কাজ করে আসছেন, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিজে শ্রদ্ধা ভরে জেনে নিতেন আর নতুন দিনের ধাত্রীবিদ্যা তাঁদের বোঝাতেন। তিনি যখন আবার মা হতে চলেছেন তখন ননীবালাদি ও মনোরমা মাসিমাকে তাঁর প্রসবকালে আসার জন্য অনুরোধ করেন। সুরুলে বাপের বাড়িতে তাঁদের দুজনের সহায়তায় তাঁর দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হল, মা একটি সুস্থ শিশু পেলেন। প্রথমটি হারানোর মর্মব্যথা এত দিনে ঘুচল। মেয়ে যাতে সুস্থ থাকে ননীবালাদির পরামর্শমতো শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য যা কিছু করা দরকার সেইভাবেই চলতে লাগলেন। নিজের মাতৃস্থানীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও শিশুপালনের শিক্ষা নিলেন। পরে বাড়িতে যে কেউ মা হতেন প্রসবকালে সবাই আমার মায়ের সাহায্য নিতেন, শিশু-পরিচর্যাতেও মায়ের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতেন। এই পুরোনো ও নতুনকে মিলিয়ে নেওয়ার ইচ্ছার জন্য পরবর্তীকালে মাকে দেখেছি আধুনিক ধারায় যে কোনও মা-শিশু ও অন্য রোগীদেরও প্রচুর জল খাওয়ানো, আলো-হাওয়া চলাচল করার জন্য ঘরের সমস্ত জানলা খুলে রাখা, একটু বেশি জ্বর হলেই মাথায় ঠান্ডা জল ঢালা, সারা গা অল্প গরম জলে মুছিয়ে দেওয়া ও হাল্কা অথচ পুষ্টিকর পথ্য জোগানোতে ব্যস্ত থাকতেন। আবার পুরোনো ধারায় বসন্তের আগমনি আবহাওয়া শুরু হলেই বসন্তের প্রতিষেধক বলে, মা অনেক কন্টিকারীর শিকড় এনে গোলমরিচ দিয়ে বেটে ছোট ছোট বড়ি করে বাড়ির সকল শিশুকে খাওয়াতেন। ছোটদের ঠান্ডা লাগলে তুলসীপাতা, আদা, মধু। বা শাকপাতা মিছরি আদা লবঙ্গের পাঁচন সিদ্ধ করে খাওয়াতেন। জ্বরের পরে কালমেঘ পাতা বেটে রস করে নিয়মিত খাওয়াতেন। আবার কালমেঘ পাতার ছোট ছোট বড়ি করে শুকিয়ে রাখতেন পরে খাওয়াবার জন্য। সর্দি হলে ছোট কাপড়ে কালোজিরে পুঁটলি করে শুঁকতে দিতেন। কাশি হলে তেজপাতাকে পাকিয়ে বিড়ির মতন আগুন ধরিয়ে টানতে বলতেন, তখনকার মতো খুব আরাম লাগত। আমাদের শোওয়ার ঘরের সামনে একটা বড় নিশিন্দে গাছ ছিল, তার ডালের ডগায় যখন বেগুনি সূক্ষ্ম ফুলগুলি ফুটত দেখতে খুব ভালো লাগত। মা বলতেন, "নিশিন্দের অনেক গুণ, কথায় বলে নিম নিশিন্দের হাওয়ায় রোগ পালিয়ে যায়।" যে কোনও ব্যথায় নিশিন্দে পাতা ও নুনের পুটলি করে লণ্ঠনের মাথায় দিয়ে একটু গরম গরম সেঁক নিলে সব ব্যথার উপশম হয়। নিশিন্দে পাতা গরম জলে ফুটিয়ে সেই জল তোয়ালে ভিজিয়ে

নিংড়ে নিয়ে সেঁক দিলেও যন্ত্রণা কমে। মাথায় সর্দি বসে গিয়ে খুব ব্যথা হলে বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে নিশিন্দে পাতা ভরে বালিশের মতো মাথায় দিয়ে শুলে ব্যথার আরাম হবেই। পাখিদের ডানা ভাঙলে বা কোথাও ব্যথা পেলে ওরা এসে ওই গাছের ডালে বসে থাকে, ব্যথা ভালো হয়ে গেলে উড়ে যায়। প্রকৃতিই ওদের জন্যও ওষুধ জুগিয়ে রেখেছে। নিশিন্দে পাতা শুকিয়ে চাল বা গমের মধ্যে দিয়ে রাখলে পোকা ধরে না। আকন্দ পাতা সামান্য ঘি দিয়ে গরম করে হাঁটুর ফোলা বা ব্যথায় সেঁক দিলে উপকার হবে। ছোটদের বুকে সর্দি বসে গেলে আকন্দ পাতা ঘি দিয়ে মৃদু গরম করে সইয়ে সইয়ে বুকে পিঠে দিলে শিশু আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। রোজ দিতে দিতে ২-৩ দিনের মধ্যে সর্দি ঝরতে থাকে ও সেরে যায়। অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে, সারছে না, গায়ে জ্বর লেগেই থাকছে, বেশ কয়েক দিন রোজ সকালে বেলপাতা, শিউলিপাতা, তুলসী পাতা একসঙ্গে রস করে বড় চামচের এক চামচ কয়েক দিন খাওয়াতেই জ্বর সেরে যায়। রক্তপাত হলে দূর্বার রস খাওয়ানো আর গাঁদাপাতার রস লাগানো বিধেয় মনে করতেন। মা মনে করতেন রক্তাল্পতায় কুলেখাড়ার রস ও থোড়ের রস নিয়মিত বেশ কিছু দিন খেলে ধীরে ধীরে রক্তের লোহিত কণিকা বাড়ে। রসুন যে কত কিছুতে উপকার দেয় তার কোনও সীমা নেই। মা প্রসূতিদের মুড়ির সঙ্গে, ভাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রসুন খাওয়াতেন, আমরা খেতে না চাইলে বলতেন, "কষ্ট করে খা। তাড়াতাড়ি শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। জানিস তো খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মশাই রসুনের রসের ইনজেকশন বের করেছিলেন। প্রসূতি মায়ের পরিচর্যায় ও নিউমোনিয়া যক্ষ্মা, আরথ্রাইটিস বা যে কোনও রকমে বাতে তা খুবই উপকার দিত।" তখন হুপিং কাশির কোনও ওষুধ ছিল না, কারও হুপিংকাশি হলে ৩টে কন্টিকারীর ফল নিয়ে (গোল বেগুনের খুব ছোট সংস্করণ) এসে বোঁটার দিকটা কেটে— বিচি বের করে তার মধ্যে বুকের দুধ ভরে গোবরের ছোট্ট ছোট্ট ঢিপির উপর বসিয়ে জাল চাপা দিয়ে রোদে রাখতেন, বেলা ১২টায় যখন তা গরম হয়ে উঠত তখন অসুস্থ শিশুটিকে খাইয়ে দিতেন। তিন দিন খাওয়ালেই ধীরে ধীরে শিশু সুস্থ হয়ে উঠত। মা জননীর ভাণ্ডার কত ঔষধিতে পূর্ণ ছিল তার সবটা হয়তো আমার জানা নেই।

সংসারের কাজ যথাসাধ্য করে দিয়ে ঘরের মোষের গাড়ি চড়ে মা শান্তিনিকেতনে যেতেন সেখানকার নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। যেতে আসতে সবার সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে যুগে বোলপুরের আর কোনও মহিলার এ রকম যাতায়াত ছিল না। মা'র মুখে শুনেছি ক্ষিতিমোহন সেনের পত্নী, আশ্রমের সকলের 'ঠানদি'র পরিচালনায় শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়, মা তাতে অনসূয়া বা প্রিয়ংবদার চরিত্রে

অভিনয় করেছিলেন। হেমলতা দেবী সকলের 'বড়মা', তাঁর কাছে মা পৌঁছে গিয়েছিলেন, বোলপুরের মেয়েদের জন্য কল্যাণকর কোনও কাজের নির্দেশের অন্বেষণে। তাঁর কাছে গিয়ে সে দিন যার সূচনা হয়েছিল, পরে বোলপুর মহিলা-সমিতি রূপে তার প্রকাশ ঘটে। বোলপুরের রক্ষণশীল নায়েক পরিবারের বাল্যবিধবা কন্যা সুনীতিপিসিমাকে পাঠাতে পেরেছিলেন হাতের কাজ শিখে আসতে। সেখানে বেশ কিছু দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে পিসিমা মায়ের মহিলাসমিতির সহকর্মী হয়ে ওঠেন। তিনি বলতেন, ''আমার আত্মজাগরণেব পথে বৌদিই আলোর দিশারী।''

শান্তিনিকেতনে সন্তোষ মজুমদারের পত্নী শৈল দেবী আমার মা শৈশবে মাতৃহীন জেনে মায়ের স্নেহে কোলে টেনে নেন। পরে যখন তিনি অকালে পতি-বিয়োগে শোকবিহ্বল, মা নিজের মেয়ের মতোই নিত্য যেতেন তাঁকে উন্মনা করতে। প্রতিমা বৌঠান, মীরা দেবী, সুধীরা দেবী সকলের সঙ্গেই তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। মনোরমা দেবীর ছোট বোন, সুধাময়ী দেবীর আপনজন সত্যদার স্ত্রী (মোহরের মা) প্রভাতদার বোন সুন্দরদি (হাসুদি-অণুর মা) সকলেরই তিনি প্রিয় হয়ে ওঠেন। এই ভাবে আশ্রমের সকল মায়ের সঙ্গে কোনও না কোনও আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। রানিদি বুড়িদি দুই বোন আর মুকুলদার পত্নী বীণাদির সঙ্গেও তাঁর প্রগাঢ় আলাপ জমে ওঠে। তখনকার মেয়েদের হস্টেল দ্বারিকবাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তবে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেশি, তাঁর নাম 'অনুকণা'। এমনি করে একদিনের ফেলে আসা সবরমতী আশ্রম যেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে ভালোবাসায় একাকার হয়ে মিলে যায়।

বোলপুরে মেয়েরা তখন পথেই বার হতেন না। নিজেদের সংসারের গণ্ডির বাইরে পা দিতে পারতেন কোনও উপলক্ষে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, পুজোপার্বণে, পৌষল্লার বনভোজন, বা মেলায় তাঁদের দেখা মিলত কখনও-বা। গোরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ির সামনে পিছনে কাপড় টাকা দিয়ে তাঁদের যেতে হত। যাত্রা কথকতা বা কীর্তনের আসরে বসতেন তাঁরা চিকের আড়ালে। তাও ঘোমটায় মুখ ঢেকে। পর্দাপ্রথা বড়ই প্রকট ছিল তখন। বাড়ির মেয়েদের কোনও সভায় যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারতেন না। পুরুষরাই পাঁচবার ভেবে তবে যোগ দিতেন। সরকারের কুনজরে পড়বেন এই ভয়ে তাঁরা আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। মা যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের বাইরে আনার চেষ্টা করছেন, তখন অনেক বাধার প্রাচীর তাঁকে পার হতে হয়েছে। অনুরোধ এড়াতে না পেরে ছোট মেয়েদের পাঠিয়ে দিতেন কেউ কেউ, তবু তার সংখ্যাও ছিল নগণ্য। শ্রীনিকেতনে মহিলা সভা ও প্রদর্শনীতে বোলপুরের কিছু

মেয়েকে অনেক চেষ্টায় আনতে পেরেছিলেন। তাঁদের হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা হত, পুরস্কারও পেয়েছিলেন কেউ কেউ। বোলপুরের মেয়েমহলে একটা কথা তখন শোনা যেত: ওই বুঝি রায়েদের বাড়ির বৌ এল, বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গেল পথে, ঘরের আগল ভেঙে। সুরুলে তাঁর বাপের বাড়ির মেয়েদেরই সভায় নিয়ে যেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল মাকে।

বোলপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা ধারক ও বাহক ছিলেন, আড়াল থেকে তাঁদের প্রতিটি মানুষকে স্নেহ ভালোবাসা ও সেবায় তিনি আপ্লুত করেছিলেন। একমাত্র ধূর্জটি জ্যাঠামশাই ছাড়া সকলের তিনি বৌদি ছিলেন। বাইরে থেকে প্রথমে এসেছিলে অনাথনাথ বসু ও সনৎকুমার ভট্টাচার্য। তবে তাঁরা স্থায়ীভাবে থাকেননি। পরে আসেন নির্মলকুমার বসু, সুধীরচন্দ্র লাহা, মলয়কুমার বসু। আরও কতজনের আনাগোনা ছিল খাদি সংঘে। সবরমতীর আদর্শে তাঁরা নিজেদের সব কাজ নিজেরাই করতেন। আর ছিলেন গোপেশ্বর দাশ— আমাদের হাবুকাকা, তিনি হাসিমুখে সকলের নীচে থেকে সবার কাজ সম্পন্ন করতেন। মাঝে মধ্যে একটু ভিন্ন স্বাদ দিতে তাঁদের ভোজনের আয়োজন হত— আমাদের বাড়িতে। ঠাকুমা বলতেন, "আহা! ওরা সব নিজেদের সাধ-আহ্লাদ ছেড়ে কত কষ্ট করে বাড়ি ছেড়ে আপনজনদের ছেড়ে এখানে এসেছে। ওদের একটু যত্ন করলে পুণ্য হবে।" রান্না করতেন বড়মা মেজপিসিমা মা সকলে মিলে। পরিবেশনের ভার ছিল মায়ের ওপর। পরবর্তীকালে খাদি সংঘ আমাদের বাড়ির আরও কাছে চলে এল রামসায়রের পাড়ে, সেই 'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।' নাম হল 'শিক্ষাগার'। তখন মা-ও সেই ঘরছাড়া মানুষগুলিকে আরও কাছে পেলেন।

মায়ের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম, একবার বর্ধমান থেকে আসার সময় স্টেশনে একটি পরিত্যক্ত শিশুকন্যা পড়ে থাকতে দেখে মা ওকে কোলে করে বাড়ি নিয়ে আসেন। বাড়িতে আসা মাত্র বিপুল বাধার সম্মুখীন হলেন। কার মেয়ে কে জানে, কোন অজাত-কুজাত বা কোনও কুমারী মায়ের সন্তান। একে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া কোনওমতে যাবে না। একান্নবর্তী সংসার— সেখানে নিজের অন্তরের অনুভবের দাম কেউ দেবে না বুঝতে পেরে ভেবে ভেবে যখন কোনও কূলকিনারা পচ্ছেন না সেই সময় কীর্ণাহার থেকে কামদাকাকা (কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাবা) এসেছিলেন। ছোট্ট শিশুটিকে নিজের কাছে রাখার কোনও উপায় যখন খুঁজে পাচ্ছেন না, কামদাকাকাকে দেখে মা তাঁকে সব কথা জানিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা বলে তাঁকে অনুরোধ করলেন ওই শিশুটির ভার নিতে। তাঁর

আপন সংসারে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করতে। বৌদির মনের কান্না তাঁর হৃদয়ে এমনভাবে ঘা দিল, তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। মা আপনঘরে যাকে ঠাঁই দিতে পারেননি তাকে এক আপন-জনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কামদাকাকা শিশুটিকে নিজের মেয়ের মতো করেই মানুষ করে বড় হলে সুপাত্রে বিয়েও দিয়েছিলেন।

১৯৪০-এ আমি (বোলপুরের প্রথম মেয়ে) ম্যাট্রিক পাশ করলাম। কলেজে পড়ার জন্যে বাবা যখন আমাকে শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনে রেখে গেলেন, দাদু জানতে পেরে বললেন, "ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাতেই মেয়ের পাত্র জুটবে না। ছেলেদের সঙ্গে পড়বে, হস্টেলে থাকবে, তা হলে কোনওদিন আর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না। বাধ্য হয়ে সন্তোষ মিত্র মশাইয়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাবা-মা ছোট ভাইবোনেদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন, বড় ভাইকে দাদু ছাড়েননি। কী আনন্দের সংসার পেতেছিলেন মা, সে লিখে বলতে পারব না। অতি অল্প আয়ে ও যৎসামান্য উপকরণে মা আমাদের অমৃত পরিবেশন করতেন। তারই মধ্যে মনোরমা মাসিমা মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ির আনাজপত্র পাঠিয়ে দিতেন। নন্দলাল বসু মশাইয়ের এর পত্নী সুধীরা দেবী, কবি-কন্যা মীরা দেবী, প্রতিমা বৌঠান, মোহরের মা, হাসুদি, অনুর মা সুন্দর মাসীমা সবাই খোঁজ রাখতেন। কিছু দিন পরে বাড়ি থেকে চাল, দুধ আসতে লাগল। বাবার স্কুলে যাওয়ার জন্য দাদুর রিকশা আসতে লাগল। তিন মাস পরে বাড়ি ফিরে যাওয়া হল। আমার পরের বোন বর্ষা সংগীতভবনে গান শিখতে ভর্তি হয়েছিল, ওর আর গান শেখা হল না। দাদুর রিকশা করে শান্তিনিকেতনে আমি ক্লাস করতে লাগলাম। অবশেষে আমার বিয়ের ফুল ফুটল, ১৯৪১ সালে বিয়ে হল। বর্ষার বিয়ে হয় ৩-৪ বছর পরে। পাড়াগাঁয়ে জমিদারবাড়িতে বিয়ে হল। মা এবং বর্ষার এ বিয়েতে মত ছিল না। ৪ বছর অসুখী, দাম্পত্য জীবন কাটাবার পর বর্ষা চলে গেল অন্য লোকে। এই শোক মাকে এমন এক শক্তি দিল! যেখানে দুঃস্থ দুঃখী মেয়ের সন্ধান পান মা তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখেন। একান্নবর্তী পরিবারে নানান বাধার সম্মুখীন হয়েও ১-২ বছর পরে সুস্থ পরিবেশে তাদের নিজেদের লোকের কাছে থিতু করে দেন। এইভাবে দুঃস্থ মেয়েদের জন্য কাজ করতে করতে একদিন সমমনের আরও কিছু মানুষের সন্ধান পেলেন মা: ফুলরেণু গুহ, মায়া ঘোষ, নীহারিকা মজুমদার-এর মতো কর্মী মেয়েদের। তাঁরা মায়ের নাম ছোট করে পঙ্কজিনী বলে নামকরণ করলেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মাকে বৌদি বলে ডাকতেন এবং বোলপুরে কোনও কাজে এলে বৌদির আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

পাড়ার এবং বোলপুরের অনেক দুঃখী মানুষের, দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য নীরবে তিনি কাজ করে যেতেন। আমার কাছে যখন আসতেন, আমার ছেলেমেয়েদের আমার ছোটপিসিমার ছেলে-মেয়েদের পুরোনো জামাকাপড় চেয়ে নিয়ে যেতেন। আমার এক পিসতুতো দাদা ডা. সত্যরঞ্জন কোনার সার্জেন ছিলেন আর আমার বৌদি মুকুলিকা কোনার মেয়েদের ডাক্তার ছিলেন। তাঁরা মাকে নিজের মায়ের মতো দেখতেন। তাঁদের মেয়ের জামাকাপড়ও নিয়ে যেতেন। এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় মস্ত এক বোঝা হত। কেউ রাগ করলে বলতেন, "বোলপুরে যে অনেক ছোট ছেলে-মেয়েদের পরনে জামা নেই— তাদের দিতে ইচ্ছে করে, কিনে দিতে তো পারি না। তাই চেয়েচিন্তে নিয়ে যাই।"

একবার কলকাতায় একটি সভায় মাকে সভাপতি হতে হয়েছিল। মা বাবাকে অনুরোধ করলেন, সভায় যে বক্তৃতাটি দেবেন, সেটি লিখে দিতে। বাবা মেয়েদের আদর্শের কথা গুরুগম্ভীর ভাষায় লিখে দিলেন, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদি আদর্শ নারীদের দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর লেখায়। বাবার লেখাটি হাতে ধরে মা সভায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময় সে লেখা হাতেই থাকল, দেশের মেয়েদের দুঃখের কথা, পরাধীনতার কথা, অসহায়তার কথা তীব্র ভাষায় বলে গেলেন মা। নারীবাদের নাম তিনি কখনও শোনেননি। জীবন থেকেই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। শাস্ত্রকথিত নারী-আদর্শের জয়গান তাই তাঁর মুখে আসেনি, স্বামী লিখে-দেওয়া সত্ত্বেও।

জীবনের শেষ কয়েকটা দিন তিনি আমার কাছে ছিলেন। রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন, তাই তাঁকে ছানা দিতাম জলখাবারে। একদিন দেখি, পরিচারিকার ছোট শিশুটিকে সেটি খাইয়ে দিচ্ছেন। আমি বকলে বললেন, "ওইটুকু শিশুকে না দিয়ে আমি কী করে খাব?" এই আমার মা। কলকাতায় চলে গেলেন। বোলপুরের মানুষজন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পেল না। এর জন্য পরে অনেকে আমার কাছে আক্ষেপ জানিয়েছেন। মেয়েদের কোনও ইতিহাস নেই। সেই না-লেখা ইতিহাসে আমার মায়ের নামটি জ্বলজ্বল করতে দেখি আমি।

নির্মলকুমার বসু: একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র

পুরোনো বোলপুরের হাটতলা পার হলেই পশ্চিম দিকে যে বাড়িটা দেখা যেত তার দেওয়ালের গায়ে কালো বোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল 'খাদি সংঘ'।

গান্ধীজির আদর্শে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডা. আশুতোষ দাস, মলয়কুমার বসু, সুধীরচন্দ্র লাহা, নির্মলকুমার বসু প্রমুখ ৪-৫ জন দেশসেবক পায়ে হেঁটে ডাণ্ডী অভিমুখে চলার পথে বোলপুরে এসে শোনেন, ১৯২১-এ গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে বেশ কিছু দিন সস্ত্রীক বসবাস করেছিলেন এমন একজন মানুষ বোলপুরে আছেন— যিনি এখানকার অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, ইনি হংসেশ্বর রায়— আমার পিতৃদেব। ওঁরা এসে আমার বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঠিক করলেন এইখানেই থেকে যাবেন। গড়ে উঠল গান্ধীজির আদর্শের মতো আশ্রম। নিয়ম-কানুন সবই সবরমতীর মতো— সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

হাটতলায় 'খাদি সংঘ' নামে একটা খাদির দোকান ছিল, যেখানে পেঁজা তুলো থেকে খদ্দর তৈরির সব রকম উপকরণই পাওয়া যেত। ওঁরা আসার পর বোলপুর সাধারণ পাঠাগারের কাছে যে খাদি প্রতিষ্ঠান ছিল— আমার বাবা যেটি চালাতেন, সেটি তুলে এনে হাটতলার খাদি সংঘের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল।

ওই সংঘ আমাদের বসতবাড়ির কাছে হওয়ায় বাবা এখানে বেশি সময় থাকতেন, রাতেও মাঝে মাঝে বাড়ি যেতেন না। আমি তখন নিতান্ত বালিকা, বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতাম, তাই এখানে প্রায়ই রাতে থেকে যাওয়ার সুযোগ পেতাম।

ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসার ঘটতে লাগল। সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। বোলপুরেও অনেক মানুষ যুক্ত হলেন এই আন্দোলনে। বিদেশি দ্রব্য বর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, মদের দোকানের সামনে পিকেটিংও চলতে লাগল। অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে 'বিদেশি শিক্ষা নেব না' আওয়াজ তুলে স্কুলের ছেলেরা লেখাপড়া বন্ধ করে বার হয়ে আসতে লাগল। আমার মা শান্তিনিকেতনে গিয়ে স্বয়ং কবির আশীর্বাদ নিয়ে এলেন— যদিও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শে সায় ছিল না, তবু তিনি কোনও বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করেননি।

বোলপুরে যখন কোনও মহিলা পথে পা রাখতেন না, তখন আমার মা পঙ্কজিনী রায় অল্প কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে শোভাযাত্রা করতে লাগলেন।

অন্য দিকে অসহযোগপন্থীরা চরকা কাঁধে করে নিয়ে শান্তিনিকেতনের ঘরে ঘরে সুতো কাটার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেন। বোলপুরের জনসাধারণকে গান্ধীজির আদর্শের কথা জানাতে সভা-সমিতি হতে লাগল। কালী-বারোয়ারিতলায় হানুবাবুর বাড়িতে কোনও এক সভায় বাবাকেও স্বদেশি গান গাইতে শুনেছি। এ-সব সভায় বড়রা দেশাত্মবোধক গান গাইতেন, তার সঙ্গে আমাদের মতো ছোটরাও কচি গলায় সেই গানের সঙ্গে গলা মেলাতাম।

এইভাবে চলছে। কাকাবাবু (নির্মলকুমার বসু) আশ্রমের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। দেশের জন্য প্রাণ দিতে দলে দলে ছেলেরা আসছে। 'খাদি সংঘ'-এ তাদের জন্য ডাল ভাত তরকারি রাঁধা হচ্ছে। প্রতিদিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশের জন্য প্রাণ তারা দেবেই। গোপেশ্বর দাশ (হাবুকাকা) তদারকি করছেন; সবাইকে খেতে দিচ্ছেন। কাকাবাবু বললেন, "ডাল-তরকারি আস্তে আস্তে কমিয়ে দাও।" তাঁর নির্দেশ মতো ক্রমেই তা কমতে লাগল। কমাতে কমাতে শেষে কাঁচা বাঁধাকপির পাতা নুন দিয়ে একদিন দেওয়া হল। ভাতের সঙ্গে একমাত্র তরকারি বাঁধাকপির টুকরো পেয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিতে আসা ছেলেরা টুপটুপ করে ঝরে যেতে লাগল। শেষ অবধি কারওই আর প্রাণ দেবার উৎসাহ রইল না। রইলেন খালি হাবুকাকা। কাকাবাবু হেসে কুটিকুটি হয়ে বললেন, "হাবুকে কোনওমতেই তাড়ানো গেল না, শুধু নিমপাতা ভাত পেয়েও তার দেশপ্রেম রইল অটুট— এবং সর্ব অবস্থায় রইল অমলিন হাসি।"

একদিন 'খাদি-সংঘ'-এর সত্যাগ্রহীদের পুলিশ একসঙ্গে গ্রেপ্তার করল। মা ঠিক করলেন দেশের বীর সৈনিকদের ফুলের মালা পরিয়ে জয়যাত্রায় পাঠাতে হবে। তাই অনেক খুঁজে পেতে জবাফুল জোগাড় করে তারই মালা বন্দিদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হল। কাকাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "এ কী করেছ বাদলরানি (আমাকে ওই নামে ডাকতেন)! অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত, বিনা অস্ত্রে যারা লড়াই করবে, তাদের সাদা ফুলের মালা না দিয়ে লাল জবার মালা দিলে!" সুধীরকাকার দিকে চেয়ে দেখি তিনিও সহাস্যবদন। তাঁরা চলে যাচ্ছেন কত দিনের জন্য কে জানে। আমার চোখে তখন জল। ধরা গলায় বললাম, "কী করব, সাদা ফুল কোথাও পেলাম না যে!' তাঁরা চলে যাওয়ার পরে খাদির কাজ বন্ধ রইল না। এত দিন যেভাবে সংঘের কাজ হত, বাবা সেভাবেই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে কাকাবাবু রামসায়রের পাড়ে বাবুর বাগানের উত্তরে যেখানে কিছু হিন্দু অথচ জল-অচলদের বাস, সেই পাড়ায় এক টুকরো জমি কিনলেন। খাদি সংঘ শিক্ষাগারে রূপান্তরিত হলে বাবা তার সম্পাদক হলেন। কাকাবাবুদের সঙ্গে আমার যোগাযোগও বেড়ে গেল, কারণ শিক্ষাগার আমাদের বাড়ি আরও কাছে চলে এল। শিক্ষাগারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মস্ত বড় একটা আমবাগান ছিল। কাকাবাবু আমাকে গাছে চড়তে খুবই উৎসাহ দিতেন, তাঁর উৎসাহ দিতেন, তাঁর উৎসাহে আমিও গাছে চড়তে শিখে গেলাম। বাড়িতে জানাজানি হল যে আমি এক গাছে চড়ুনি মেয়ে। এতে আমার দূর ভবিষ্যতের কল্পিত শ্বশুরবাড়িতে কতখানি অপযশ হবে তাই চিন্তা করে আমার অভিভাবকেরা, আমার এবং আমার প্রশ্রয়দাতা কাকাবাবুর বিশেষ নিন্দা করল। যে-যাই বলুক আমি কিন্তু মহা আনন্দে আমার গাছে চড়া চলিয়ে যেতে লাগলাম। এ ছাড়াও কত দিন তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন পশ্চিমের মাঠের আল ধরে; তখন আমার সেই ছোট্ট বয়সের আবোল-তাবোল কথা অনর্গল বকে যেতাম, আর উনি মন দিয়ে শুনতেন, তিনি শুনতেই যেন ভালোবাসতেন, বলতেন না বেশি।

মাঠের মধ্যে একটা ছোট পুকুর ছিল, তার নাম নোরঘুসি। তার পাড়ে একটা বড় নিমগাছ ছিল। তার তলায় বসে কোনও কোনও দিন কাকাবাবু গান গাইতেন। পশ্চিম গগনের অস্তরবির গোধূলি আলোয় সেই নির্জন নিঃশব্দ খোলা মাঠে তাঁর ভরাট গলার গান শুনতে শুনতে মন যেন কোথায় হারিয়ে যেত।

পরে শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় তাঁর গলার গান যখনই কোথাও শুনতাম, তখন কাকাবাবুর জন্যে মন কেমন করত।

পাড়ার সব মেয়েরা একত্র হলে এক-একদিন কাকাবাবু একটা মজা করতেন। একটা শিং-ওয়ালা রামছাগলের দুটো শিঙের মাঝখান দিয়ে একটা লাঠি বেঁধে দিতেন। লাঠির মাঝখানে একছড়া কলা ঝুলিয়ে দিতেন। ছাগল বেচারি পায়ের খুর ঠুকে ঠুকে শিং উঁচিয়ে যতই কলাছড়াটা ধরতে যেত, কোনওমতে তার নাগাল পেত না। আবোল-তাবোলের সেই খুড়োর কলের মতো তার অবস্থা তখন সঙ্গিন। সুখাদ্যের আস্বাদ পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় বেচারির মরিয়া ভাব যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছত, তখন কাকাবাবু কলাছড়াটি খুলে নিয়ে একটি একটি করে তাকে খাওয়াতেন। আমরা সবাই হেসে কুটিকুটি হতাম। বলতাম, "ওকে খেতেই যদি দেবেন, এত সময় ধরে ওকে এত কষ্ট দিলেন কেন?" উত্তরে বলতেন, "নিজের চেষ্টা না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না। এইটা ওকে আর তোমাদের বোঝাবার জন্য এই খেলাটা।" চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই এই আপ্তবাক্যটি খেলার ছলে তিনি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি শিশু হয়েই মিশতেন। তাঁর দৃপ্ত চেহারা, আভিজাত্যপূর্ণ গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্যের গভীরতা কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তায় আমার আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড।

একবার খুব জব্দ হয়েছিলাম। অঘ্রান মাসের শেষে যখন ধান কাটা হয়ে যায়, তখন আমাদের ও দিকে পৌষ মাসের শূন্য মাঠে বনভোজন হত। তাকে বলা হত পৌষল্লা। সারা পাড়ার লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে করত বনভোজন। বড় বড় উনোনে কাঠের জ্বালে বিশাল বিশাল হাঁড়ি কড়াই বসিয়ে খিচুড়ি রান্না হত। খেতে দেরি হত বলে মুড়ি-বেগুনি-জিলিপি-বোঁদে ইত্যাদি জলখাবারের আয়োজন থাকত, মস্ত বড় শতরঞ্চি বিছিয়ে সবাই বসতাম। নানা রকম খেলা হত। বড়রা গল্প করতেন, আমরা শুনতাম।

একবার কাকাবাবু তাঁর ক্যামেরা আর স্লাইড প্রজেক্টর নিয়ে এসেছিলেন। আমার পরিব্রাজক কাকাবাবু সারা ভারত ঘুরে নানান প্রদেশের আদিবাসীদের নিয়ে নৃতত্ত্বের গবেষণা করেছেন। সে দিন তিনি স্লাইড দিয়ে ওড়িশার সরাইকেল্লার আদিবাসীদের ছবি দেখাচ্ছিলেন। একটা ছবিতে ছিল এক বৃদ্ধা মহিলা খেজুরপাতা দিয়ে চাটাই বুনছেন। হঠাৎ কাকাবাবু বলে উঠলেন, "সবাই ভালো করে দেখো, এটা বাদলরানির শাশুড়ির ছবি।" শোনামাত্র সবাই হো হো করে হাসতে লাগল আর খেপাতে শুরু করল। "এ মা, তোর কেমন শাশুড়ি রে? বুড়ি থুত্থুড়ি তবু চেটাই বুনতে পারে!" এমন ঠাট্টায় আমি কেঁদেই সারা। কাকাবাবু বলতে থাকেন, "না, না, তোমার জন্য খুব সুন্দরী শাশুড়ি খুঁজে আনব, মন খারাপ করতে হবে না, এখন খাবে চলো।"

বোলপুরের কাছে কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা হয়, মকর সংক্রান্তিতে। নানা স্থান থেকে বাউলরা ওই মেলায় আসেন। মেলাপ্রাঙ্গণ তাঁদের মধুর গানে ভরে ওঠে। আশেপাশের মানুষজন ছাড়াও দূর-দূরান্তর থেকে আসা বহু যাত্রীর আগমনে মেলা জমজমাট হয়ে ওঠে।

ঠাকুমা অনেক দিন থেকে জয়দেবের মেলায় যেতে চাইছিলেন; তাই সে বারে বাড়ির সবাই আর পাড়ারও অনেকে বাসভর্তি হয়ে জয়দেব কেন্দুলি অভিমুখে যাত্রা করলাম। নতুন একটা অভিযানে যাব ভেবে আমাদের— ছোটদের আনন্দ আর ধরে না। এই আনন্দে আমরা খুবই মেতে উঠলাম। বাবা-সুধীরকাকা-কাকাবাবু-হাবুকাকা এঁরাও সঙ্গে চললেন। বেশ খানিকটা পরে 'চৌপড়ি'র জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাদের গাড়ি হঠাৎ অচল হয়ে গেল।

সবাই যখন হতবুদ্ধি, তখন কাকাবাবুরা খুঁজতে লাগলেন চারপাশে কোথাও কোনও গ্রাম আছে কি না। বেশ কিছুটা পরে ওঁরা দু'তিনটে গোরুর গাড়ি নিয়ে এলেন। আমরা ভাগাভাগি করে উঠে পড়লাম সেগুলোতে। তাঁরা পেছন পেছন হেঁটেই চললেন। মেলায় পৌঁছে আমরা যখন নদীতে স্নান, জয়দেব-পদ্মাবতীর মন্দিরে প্রণাম ইত্যাদি সেরে বেগুনি-পাঁপড়ভাজা-মুড়ি-বোঁদে-জিলিপি দিয়ে টিফিন করছি, তখন দেখি দূরে বাবা-কাকাবাবুরা মানব-সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা মেলায় আগতদের রাশি রাশি দেহবর্জ্য পরিষ্কার করে। তাঁদের মুখে ঘৃণার লেশমাত্র নেই, 'ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে' এই বোধে উদ্বুদ্ধ এঁরা। মানুষের সেবা করতে পেরে তাঁরা ধন্য।

ব্রিটিশ রাজশক্তি এই সব সেবাব্রতী অহিংস মানুষগুলিকে ভয় পেত। দুঃখ ঘোচাবার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে চেতনা জাগাবার যে ব্রত এঁরা নিয়েছিলেন তাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখত। তাই গান্ধীজির নির্দেশে ১৯৩০-এর আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাকাবাবুরা কারারুদ্ধ হলেন।

বেশ কিছুকাল পরে কাকাবাবুরা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। আমরা আবার শিক্ষাগারে খেলতে যেতে লাগলাম। বিশেষ করে আমি তো কাকাবাবুর সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেলাম। তিনি যখন একমনে লেখাপড়া করতেন আমিও একটা বই নিয়ে পড়তে বসে যেতাম। লেখাপড়া শেষ হলে আবার বাবুর বাগানে গাছে চড়ার চর্চা হতে লাগল। এখন তো কিছুটা বড়, তাই আগের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারি।

একবার দেশে খুব ম্যালেরিয়া দেখা দেয়— আমিও তার শিকার হলাম। তখন এই রোগের একমাত্র ওষুধ ছিল কুইনিন— যার সাদা গুঁড়োগুলো খুবই তেতো

লাগত, আমি কিছুতেই খেতে চাইতাম না। বাবা একদিন রেগে বললেন, "চল তোকে নির্মলের কাছে নিয়ে যাই।" গিয়ে দেখি কাকাবাবু হাতের তেলোয় কুইনিন নিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী করে এমন করে কুইনিন খান? আমার যে বড্ড তেতো লাগে।" তিনি বোঝালেন যে ম্যালেরিয়ায় এর চেয়ে অনেক কষ্ট এবং আমাকেও ওই ভাবেই কুইনিন খাওয়া অভ্যেস করতে হবে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কুইনিন আর মায়ের দেওয়া কালমেঘের রস খেতে আর কোনও দিনও আপত্তি করিনি।

বোলপুর কংগ্রেস কমিটির যখন সভা হত, বাবা-কাকাবাবুর সঙ্গে আমিও সেখানে থাকতাম। সেই সভায় তাঁকেই প্রধান ব্যক্তিত্ব বলে মনে হত। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে কংগ্রেসের সকল কর্মীকেই তিনি নানাভাবে সমালোচনা করতেন। যে কোনও কর্মীর ছিদ্রটুকু লক্ষ করে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন যে, সে যেন এই দিকে মন দেয় এবং স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে একজন সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। বাবা আর হাবুকাকা কোনও দিন সমালোচিত হতেন না।

একদিনের একটা মজার ঘটনার কথা বলি। বোলপুর হাটতলার খাদির দোকানে বাবা ও কাকাবাবু দুজনেই বসতেন। একদিন কাকাবাবু দোকানে বসার পর বাবা বাড়ি চলে আসেন। রাত্রে কাকাবাবু আমাদের বাড়িতে এসে মাকে ডেকে বললেন, "বৌদি দেখুন, টাকায় কেমন ডিম পেড়েছে। আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।" মা অবাক হয়ে শুনছেন দেখে বললেন, "আপনার পতিরত্নটি হিসেবে গরমিল করে নিজের পকেট থেকে টাকা রেখে এসেছেন। এ-টাকা আপনার প্রাপ্য, তাই দিয়ে মুক্ত হলাম।"

কাকাবাবু শিক্ষাগারেই থাকতেন। ওই পাড়ায় যাঁরা বাস করতেন তাদের সকলেই ছিল তাঁর আপন। এর মধ্যে চর্মশিল্পী গোপালকে তাঁর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে ১৫ মাইল দূরে কীর্ণাহারে চামড়া পাকা করার কাজ শেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে গোপালদাকে চামড়ার কাজের ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষাগারে রাতের স্কুল বসত। ও-পাড়ার হাড়ি-ডোম-মুচি-বাউরি দিনে যাঁরা চাষের কাজ করতেন তাঁরা অনেকেই মোটামুটি লিখতে পড়তে শিখেছিলেন। কাকাবাবু লক্ষ করেন যে হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরেও জাতিভেদ প্রথা ভালোভাবেই রয়েছে। জাতিগত বৃত্তি অনুযায়ী কাজ পাওয়ার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিই এই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের নিজের সমাজ সম্বন্ধে গভীর বোধ ও চেতনা দেখে কাকাবাবু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সমস্ত সমাজের নীচের থাকের মানুষদের সামাজিক বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। সে-সম্পর্কে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা ও মন্তব্য আছে। সেগুলি বারবার পড়ার যোগ্য।

কাকাবাবু রামসায়রের পাড়ের অন্ত্যজ সমাজের প্রতিটি মানুষকে আলাদাভাবে জানতেন, তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের কারণে তারাও তাঁকে হৃদয়ের গভীরে জায়গা দিয়েছিলেন। বোলপুর শহরের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে নিজেদের মানুষ বলে জানলেও একটু দূরত্ব যেন থাকতই। তাঁর বলিষ্ঠ শরীর, বিদ্যার দ্যুতি, অভিজাত ব্যক্তিত্বই ছিল এর কারণ। খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরে তাঁর নিজস্ব সাইকেলটি চড়ে বোলপুরের পথ ধরে শান্তিনিকেতন অভিমুখে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত।

তখনকার মেয়েদের হস্টেল দ্বারিকেও তাঁর যাতায়াত ছিল। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে চরকায় সুতো কাটার প্রচলন, খাদি এবং গান্ধীজির আদর্শের প্রচারের জন্যই তাঁকে সেখানে যেতে হত। ফলে অনেকের সঙ্গেই তাঁর আলাপ হয়েছিল। কাকাবাবুর বৌদি বলে আমার মায়ের সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

১৯৩২-এর শেষে জেল থেকে ফিরলে কাকাবাবু বহুতর কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেও আমি কিন্তু তাঁর কাছে কাছেই রয়ে গেলাম। তাঁর অপার স্নেহে আমার দিনগুলিকে তিনি ভরিয়ে রেখেছিলেন। বাইরের অনেক কাজ করলেও কাকাবাবুর লেখাপড়ার বিরাম ছিল না। মন্দিরের স্থাপত্যরীতি, আমাদের সমাজের জাতি-বিন্যাস, বাংলার সমাজ ও নিজস্ব সংস্কৃতি এবং তার বদলে যাওয়ার প্রকৃতি, গান্ধীজির মতবাদ ও তার পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে নানান প্রবন্ধ তিনি লিখছিলেন। নবজীবন ট্রাস্ট থেকে Selections from Gandhi বইটি প্রকাশিত হয়। ছোট আকারের সেই বইটি দেখতে যে আমার কী ভালোই লাগত। নাড়াচাড়া করতেও ভালোবাসতাম। মনে হত আমার সামনেই বইটি লেখা হয়েছে। আমার কাছে এই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। ইংরেজি ভাষার সীমিত জ্ঞান নিয়েও বইটি পড়ার চেষ্টা করতাম।

ওই বছরেই শান্তিনিকেতনে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম— সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসতাম। হাবুকাকা আমাকে সকালে দিয়ে আসতেন, আর বাবা আমাকে নিয়ে আসতেন। শান্তিনিকেতন তো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। বীরভূমের একমাত্র মেয়ে বলে আমাকে এই সুযোগটুকু দেওয়া হয়েছিল। সন্ধেবেলা ফিরে প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাঠভবন ও শ্রীভবনের অনেক গল্প করে তার পর বাড়ি আসতাম। কাকাবাবুর কাছে আগের মতো থাকতে পারি না বলে মনে দুঃখ হত। পরের বছর

থেকে আমিও আবাসিক হয়ে গেলাম। হৈমন্তীদি তখন আমাদের শ্রীভবনের তত্ত্বাবধায়িকা। কাকাবাবু শান্তিনিকেতনে এলেই শ্রীভবনে আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কোনও কোনও দিন হৈমন্তীদির অনুমতি নিয়ে তিনি আমাকে অনিলদা-রানিদির বাড়ি নিয়ে যেতেন। কখনও বা কৃপালিনীজির রতনকুটিরের ঘরের বারান্দায় ওঁরা গল্প করতেন, কোনও গভীর তত্ত্বকথা নিয়ে হয়তো আলোচনা হত, আমি নিজের মনে খেলে বেড়াতাম।

ইংরেজি ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সালের শেষ অবধি আমি পাঠভবনে পড়ার সুযোগ পেলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগও পুরোপুরি রইল। বাবার শরীর খারাপ হওয়ায় ডাক্তার বললেন হাওয়া বদলের জন্য দুমকায় যেতে। আমরা দুই বোন সারা দিন মায়ের কাজে সাহায্য করি, ছোট ভাই-বোন দুটিকে সামলাই। লেখাপড়া করার কোনও সময় পাই না। ফিরে আসার পরে বাবা বললেন, "যে ছুটির পড়া করে না তাকে আর পড়তে হবে না।" শান্তিনিকেতনের জীবন শেষ হয়ে গেল, ব্যথা ও যন্ত্রণায় মনে মনে গুমরে মরি। গোপন কান্নায় নীরবে দিন কাটে। তখনও কাকাবাবু বোলপুরে আছেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যান। যে দিন কলকাতা থেকে ফেরেন, সে দিন স্টেশন থেকেই সোজা আমাদের বাড়ি এসে 'বাদলরানী' বলে ডাক দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষাগারে যান।

১৯৩৭-এর ঠিক কোন সময় মনে নেই— বোলপুরের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন করার ব্যবস্থা হয়। বোলপুরে ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনেও মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন, ৩০/৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও বেশ সাড়া মিলেছিল। তখনকার গান্ধীবাদীদের নীতি ছিল দেশ আগে, দল পরে। বিশেষ করে বাবা-কাকাবাবুকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি বলেই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক— তিনি যে দলেরই হোন না, তাঁকে তাঁরা কাছে টেনে নিতে একটুও দ্বিধা করতেন না। তাই বড় আকারের সেই সম্মেলন যখন হল, তখন বোলপুরের মানুষ সব দেখে-শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এই-বছরেরই শেষ দিকে কাকাবাবুকে ঘন ঘন কলকাতা যেতে হচ্ছিল। শুনলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করেছেন। কলকাতায় থাকলেও বোলপুরের সঙ্গে তাঁর যোগ ঠিকই রইল। যখনই আসতেন আমি তাঁর কাছে কাছেই থাকতাম, তাঁর কাছ থেকে কলকাতার গল্প শুনতাম। তাঁর দন্তচিকিৎসক বন্ধু বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে জানতাম অনেক আগে থেকে। বঙ্কিমকাকার ভাই কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে

আমার শিক্ষক ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই বাংলা লেখার জন্য উৎসাহ প্রেরণা পাই। বঙ্কিমকাকার ভাইও কাকাবাবুর সূত্র ধরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

এই সময়ে কাকাবাবু হাজরা রোডের একটি বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ সেখান থেকে খুব একটা দূর ছিল না। বেশ কয়েক দিন বাবা আমাকে নিয়ে ওই বাড়িতে ছিলেন। তখন মহানির্বাণ রোডে আমার বন্ধু থাকত। ও চিঠি লিখে ওর ঠিকানা দিয়েছিল, আমার খুব ইচ্ছে একবার ওর কাছে যাই। বাবা বললেন, আমি কি চিনে যেতে পারব। এ-অঞ্চল আমার অত পরিচিত নয়। কাকাবাবু শুনে ঠিকানা খুঁজে আমাকে নিয়ে সেই বাড়িতে গেলেন। যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনি কাকাবাবুকে দেখে হইহই করে উঠলেন, "কী কাণ্ড, তুমি এসেছ কী ভালো লাগছে, কত দিন পরে দেখা!" বুঝলাম ওঁরা দুজনে বন্ধু— নাম মণীশ ঘটক। কাকাবাবু তখন 'মহাশ্বেতা'টি কে জানতে চাইলেন! খুকু তখন বার হয়ে এসেছে। তাঁর বন্ধুর প্রথমা কন্যাটির নামই মহাশ্বেতা। ফেরার পথে কাকাবাবুকে বললাম, "কেমন মজা হল বলুন, আমার বন্ধুকে দেখাতে নিয়ে এসে নিজের বন্ধুকে দেখতে পেলেন।" তিনি কথা না বলে হাসিমুখে চলতে লাগলেন।

কোনও কারণে হাজরা রোডের বাসা তুলে দিয়ে, উত্তর কলকাতার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের একটি ছোট্ট বাসায় কাকাবাবু চলে এলেন। আমাকে রেখে এলেন বোসপাড়া লেনে তাঁর মামাতো বোন বিভাময়ী বসুর বাড়িতে। প্রথম যে দিন সে বাড়িতে কাকাবাবুর সঙ্গে যাই, পথে আমাকে বেথুন স্কুল ও কলেজ দেখিয়ে বললেন, "কোনটা ভালো— বেথুন না শান্তিনিকেতন?" উত্তরে আমি বললাম, "বা-রে, বাইরে থেকে দেখে আমি কী করে সে কথা বলব?" আমার কথায় তিনি খুশি হয়ে উঠলেন। এক ভদ্রলোক আমাদের পাশে বসেছিলেন। আমি কে তিনি জানতে চাইলে কাকাবাবু বললেন, আমি তাঁর মেয়ে। আমি অন্তরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

কলকাতার এক সুপ্রাচীন পল্লির— অভিজাত বনেদি পরিবারের এক বাড়িতে আমার ঠাঁই হল। কাকাবাবু তাঁর বোনকে বললেন, "মেনু, আমি বাদলরানিকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।" হাসিমাখা মুখখানি দেখে তাঁকে আমার খুব আপন মনে হল। এক মাস রইলাম সে বাড়িতে।

কাকাবাবু মাঝে মাঝেই আসতেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। কিন্তু পিসিমা তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলেন বলেই আমার মনে হত। কাকাবাবুর আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের ঘরে প্রথম যে দিন আমাকে নিয়ে গেলেন, আমার মনে হল ঘরটা যেন খুব চেনা। সে বার কলকাতা যাওয়ার আগে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্নে কাকাবাবুর

ঘরের যে চেহারা দেখেছিলাম অবিকল সেই রকম দেখতে ঘরটা: পুরো ঘরের ওপরে চার দিকেই টানা তাক, আর সেই তাকগুলো বইয়ে ভর্তি।

কাকাবাবুর ঘরের পাশেই দোতলার ওপরে থাকতেন যামিনী রায়, আর এক দিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করবাবুকে শৈশবে বোলপুরে দেখেছিলাম, কিন্তু সে দিন তাঁর দেখা পাইনি। যামিনী রায়ের ঘরে গিয়ে, এই সৌম্যদর্শন শিল্পীকে প্রণাম করে ধন্য হলাম। তাঁর ঘরখানি সাজানো দেশজ রীতিতে। মেঝের ওপর ধবধবে সাদা চাদরে ফরাস পাতা। দুটি ছোট কাঁসার কলসে পদ্মফুল। আলাপ হল তাঁর মেয়ে পারুলের সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গেলাম।

পরের বারে আবার এলাম ১৯৪০-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। তখন এক মাস ছিলাম। এ বারে দেখি কাকাবাবু একটা ছোট্ট গাড়ি কিনেছেন। সেই গাড়ি করে পিসিমাকে আর আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। একদিন পিসিমার দিদির বাড়ি দমদমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের নাম তো ছোট থেকে শুনেছি কিন্তু যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কাকাবাবুর সঙ্গে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গেলাম।

ছোট থেকে যাঁর আদরে-প্রশ্রয়ে বড় হয়ে উঠলাম তাঁকেও স্নেহ করার মানুষ যে আছেন, তা খেয়াল করিনি। একদিন বিকেলে এসে বলে গেলেন সেদিন রাতে তাঁর মায়ের কাছে খেতে যাব আমরা দুজনে। মা আছেন তাঁর মাসির বাড়িতে। বাঙালি ঘরের বিধবা, আর পাঁচজনের মতোই তাঁর বেশ, কিন্তু অন্তরে একমাত্র ছেলের জন্য যেন মায়াময় ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে। তিনি থাকেন একা 'সুধাসিন্ধু' নামের বাড়িতে। কয়েক দিনের জন্য কলকাতা এসেছেন ছেলেকে দেখতে। রোজ তো কাছে পাবেন না, তাই একদিনেই যা কিছু খেতে ভালোবাসেন সব সারা দিন ধরে রান্না করেছেন, ছেলেকে এবং তাঁর কন্যাসম আমাকে খাওয়াতে। কাকাবাবুর একজন দিদি ছিলেন। তাঁর মেয়ের নাম সুধা, যার নামে 'সুধাসিন্ধু' নামের বাড়ি। দিদির একমাত্র ছেলের নাম অজিত। বর্ধমানে রেলে পিষ্ট হয়ে মারা যান। কাকাবাবু একমাত্র ছেলে, বিয়ে করেনি বলে মনে হয় তাঁর দুঃখ ছিল। বোনপো অজিতদা থাকলে নাতির সংসার দেখে তিনি কিছুটা শান্তি পেতেন। আমাকে কাকাবাবুর মেয়ের মতো জেনে তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন।

আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমার সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত সাধারণ গ্রামীণ ঘরের মেয়ের যা একমাত্র গতি, সেই বিয়ের চেষ্টা চলছিল কিছু দিন ধরে। আই. এ. প্রথম বছর পরীক্ষা দিচ্ছি। এমন সময় শুনলাম পাত্রপক্ষ দেখতে আসবেন, সঙ্গে পাত্রও থাকবেন। যে দিন তাঁরা এলেন সেদিন কাকাবাবুও ছিলেন। মেয়ে দেখাব

পালা সাঙ্গ হলে কাকাবাবুর কাছে আসতেই উনি বললেন, "সুদর্শন ছেলেটিকে দেখে আমার ভালো লাগল। তোমার মত কী?" উত্তরে বললাম, "বারে, একবার দেখে বুঝি কিছু বোঝা যায়!" উনি খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, এত দিনে আমি নাকি সত্যি বড় হয়ে গেছি।

শেষ অবধি বিয়ের ফুল ফুটল। ১৯৪১ সালে আমার বিয়ে হয়। বিয়েতে কাকাবাবু উপস্থিত ছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে কাকাবাবু নিয়মিত আমাকে দেখতে আসতেন। আমার স্বামীর সঙ্গে সুযোগমতো কাকাবাবুকে দেখতে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাসায় যেতাম। কিছু দিন কলকাতায় থেকে আমি শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে কটকে যাই। সেখান থেকে ঢেঙ্কানল হয়ে অনুগুলে যাওয়ার পথে জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা পথের দৃশ্য আমাকে অভিভূত করে। এমন দৃশ্য কখনও দেখতে পাব কল্পনাও করিনি। কটকে ফিরে কাকাবাবুকে ওই পথের বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন ওই পথ ওঁরও খুব ভালো লাগে। যদি আর কোথাও বেড়াতে যাই আমি যেন তাঁকে চিঠি লিখে জানাই। অত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কত বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর কাজের জগতের পরিধিও ছিল বিশাল ও বিচিত্র। তবু আমার মতো এক সামান্য মেয়ের সঙ্গে আমার মতো করেই মিশতেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির কোনও ভার সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

পরের বছর ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলনের আরম্ভে ২ আগস্ট কাকাবাবু ও অন্যদের সাহায্যে বাংলা 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশিত হল। কাকাবাবু সেখানে গান্ধীজির লেখা The fire that rages in me বাংলায় অনুবাদ করেন। এর পর ৯ অগস্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা হয়। গান্ধী-নেহরু সহ সারা ভারতের সমস্ত বিশিষ্ট নেতা কারারুদ্ধ হন। এই আন্দোলনে বোলপুর যখন উত্তাল তখন কাকাবাবুর চিঠি পেলাম। "বাদলরানী, ২ দিন পরে পৌঁছব। আমার জন্য ঝোলভাতের ব্যবস্থা রেখো।" কিন্তু হায়, সে দিন অপেক্ষা করাই সার হল। জানা গেল কাকাবাবু কারারুদ্ধ হয়েছেন।

তার পর কত দিন তাঁর খবর পাই না। চোখে দেখার তো কোনও প্রশ্নই নেই। শেষে ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বোলপুরে এলেন। তাঁর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে চেনাই যায় না। মুখের হাসিটি তবুও অম্লান। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ভঙ্গিও একই রকম। মন খারাপ করে যখন বললাম যে তাঁকে দেখে আমার একটুও ভালো লাগছে না— উত্তরে তিনি বললেন, "বাইরে এসে গেছি, দেখো না দুদিনে সেরে উঠব।" খাওয়ার আগে কলার মধ্যে একটু হিং পুরে খেতেন।

দেশি নানান ওষুধে তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। খাওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সংযমী। নিয়মিত আসন করতেন। নিজের শরীর ঠিক রাখার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

প্রসঙ্গত বলি, ১৯৪৩-এ যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়, কাকাবাবু দমদম জেলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে প্রথম শ্রেণির বন্দি হয়ে তাঁরা যে ভালো খাবার পাচ্ছেন, তার মান হ্রাস করে সেই টাকায় দুর্গত মানুষদের খেতে দেওয়া হোক। প্রথম শ্রেণির অন্য বন্দিরা এই ডাকে সাড়া দেয়নি! কিন্তু তিনি বেশ কিছু দিন এক বেলা আহার বর্জন করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর ওজন বেশ কমে যায়।

বোলপুরের পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল ভুবনেশ্বরে। তিনি মাসে একবার করে পুরী যেতেন মাকে দেখতে। আমি ভুবনেশ্বরে আছি জেনে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে দেখতে পেয়ে আমার মনের ভেতরটা আনন্দে ভরে গেল, আরও ভালো লাগল, কারণ তিনি আগের সেই বলিষ্ঠ চেহারা ফিরে পেয়েছেন। এর কিছু দিন পরে কটকে 'নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' হয়েছিল। অতিথি সদস্যরূপে তিনি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই সম্মেলনের প্রধান আয়োজক ছিলেন আমার খুড়শ্বশুর নরেন্দ্রনাথ সুর। সম্মেলনের পরে আমার খুড়শ্বশুর কাকাবাবুর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, "ওড়িশার মানুষ হয়েও আমরা কিছুই জানতাম না। উনি আমাদের চোখ খুলে দিলেন। কোনারকের স্থাপত্য, সেগুলির ইতিহাস, মন্দির যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁদের সমাজ ও জীবনধারা। তাঁদের উত্তরসূরিরা এখনও ভুবনেশ্বরের পাথুরিয়াশাহিতে বাস করেন, তাঁদের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সবই তাঁর জানা, তাঁর মুখ থেকে যখন জানা হল, নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হলাম।"

আমাকে বেশ কিছু দিন রাঁচির কাঁকের মানসিক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এখানে একদিন দরজায় টোকা শুনে খুলে দেখি হাস্যমুখে আমার কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ময়ে আনন্দে আমি হতবাক। এই অপ্রত্যাশিত পাওয়ায় আমার চোখের জল বাধা মানছে না। শেষে কিছুটা সামলে নিয়ে বললাম, "কেমন করে এলেন?"

রাঁচিতে কাজে এসেছিলেন, বাবার চিঠিতে আমার কথা শুনে আমাকে না দেখে কলকাতা ফেরেন কী করে?— তাই এসেছেন। আমি তাঁর পা-দু'খানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। কয়েক ঘণ্টা আমার কাছে রইলেন, প্রশ্ন করে আমার সব সমস্যা জেনে নিয়ে, সমাধানের উপায় ছোট ছোট সূত্র দিয়ে বলে গেলেন। নতুন করে প্রেরণা পেলাম নির্ভয়ে সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে।

রাঁচিবাস শেষ হলে কলকাতায় এসে আবার অন্তঃপুরবাসিনী হলাম। সংসারের নানান খুঁটিনাটি কাজে দিন কাটে। এমনি করে দিন যায়। কাকাবাবু মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে ২-১ জন ছাত্রীকে নিয়ে 'বাদলরানী' বলে হাঁক দিয়ে এসে পড়েন, নিজের নাম সার্থক করে নির্মল বায়ু বইয়ে দেন আমার চারপাশে। এমনি করেই একদিন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ভারতপ্রেমিক হ্যালডেনের পত্নীকেও নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি। আমাদের সাধ্যমতো তাঁর আপ্যায়ন করলাম। আমার ছোটবোন ঝর্না খালি গলায় তাঁকে একটি রবীন্দ্রসংগীত শোনাল। কাকাবাবু ও দেশের সুর ও গানের সঙ্গে আমাদের সুর ও গানের পার্থক্য বোঝালেন অনেকক্ষণ ধরে।

কাকাবাবু যখন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সভাপতি, 'ভারতকোষ' নামে এক বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়; যার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি। ভারতকোষের সহ-সম্পাদকদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, তিনি কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে বোলপুরে আমাদের বাড়ি যান। ইলামবাজার মন্দিরের টেরাকোটার কাজ ও আমাদের শিক্ষাগার দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ইনি ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী। কাকাবাবু যেমন ভারতকোষের সহ-সম্পাদক হিসাবে ওই কর্মী মানুষটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি, গান্ধীবাদী আমার বাবারও তাঁর আপনজন হয়ে উঠতে দেরি হয়নি।

বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আগ্রহে বিধানসভার নির্বাচনে আমার বাবা ১৯৫২ সালে বোলপুরের প্রার্থী হন। কাকাবাবু খবর পেয়ে বোলপুরে আসেন ও গ্রামের মানুষদের কাছে কংগ্রেসের প্রার্থী ও নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী একজন সৎ মানুষকে জয়ী করতে আহ্বান জানান। গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাবার পক্ষে প্রচার করতে থাকেন।

একদিন রাত্রে বাহিরী গ্রাম থেকে ফিরে এসে বাবাকে বললেন, "দেখছেন তো, এই কত দূর গ্রামেও মার্কস-লেনিনের তত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী এমন মার্কসবাদীর সম্মুখীন আপনাকে হতে হচ্ছে। মার্কসবাদ ভালোভাবে না জানলে তাদেরকে আপনি মার্কসবাদের সঙ্গে গান্ধীজির মতবাদের তুলনামূলক আলোচনায় স্বপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কেমন করে প্রমাণ করবেন? নিয়ম করে এখন থেকে লেনিন ও মার্কসের মতবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা করুন— নইলে গান্ধীবাদের সপক্ষে নিজের প্রতিবাদ জানাবেন কী করে?"

কাকাবাবু কত বিচিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল খুবই কম। কিন্তু ১৯৫৬ সালে সাড়ে চার মাস শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাড়ে চার মাস ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

অতিথি অধ্যাপক হিসাবে নিমন্ত্রণ পান। সেখানে তিনি ভারতের সভ্যতার সামাজিক গঠন, আধুনিক ভারতের জাতিব্যবস্থার পরিস্থিতি, বাংলার মন্দিরের ভাস্কর্য, জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীবাদ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ফেরার পথে তিনি জাপান-জাভা-কম্বোডিয়া ও ব্যাঙ্ককের মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন। ইচ্ছে ছিল সেখানকার মন্দিরগুলির সঙ্গে পূর্ব ভারতের মন্দিরগুলির তুলনামূলক আলোচনা করবার। ফিরে এসে আমাদের কাছে বিদেশভ্রমণের গল্প বিশদভাবেই করেছিলেন।

আমার মনে কত গর্ব হত যে, আমার কাকাবাবু সারা ভারতের গিরিবাসী-আদিবাসী-হরিজন প্রমুখ অন্ত্যজ মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখে, তাঁদের দুঃখ-দারিদ্র, রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন।

এর মধ্যে তিন বছর তিনি দিল্লিতে ছিলেন। মাঝে মধ্যে কলকাতা এসে আমার মতো অখ্যাত থেকে আরম্ভ করে বহুজনের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। কারও কোনও একটু অসুখের কথা শুনলে তাঁর জানা নানা আয়ুর্বেদিক ওষুধ-গাছ-গাছড়া-শেকড়-বাকড়ের সন্ধান করে নিজে কিনে সেগুলি নিয়ে রোগীর বাড়ি বয়ে দিয়ে এসেছেন। কেমন করে কতবার কত দিন খেতে হবে তাও বলে এসেছেন।

দিল্লির কাজ শেষ হলে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে এলেন। আবার সেই আগের মতো সাইকেলে ঘুরতে লাগলেন। সাহিত্য পরিষদে 'ভারতকোষ'-এর কাজ নিয়মিত আরম্ভ করলেন। আমার মতো কতজনকেই তো তিনি স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। তিনি পরিচিত সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। যে কেউ তাঁর কাছে অনায়াসে যেতে পারত। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে তাঁর কাছে কেউ এলে, সেই সমস্যার গভীরে ঢুকে তা নিরসন করবার কোনও ত্রুটি রাখতেন না। বেশির ভাগ সময়েই তাঁর মত নিয়ে কাজ করে অনেকেরই উপকার হয়েছিল।

কলকাতায় নকশাল আন্দোলনের সময় কাকাবাবু বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছেন। স্বভাবতই পিসিমা ও বাড়ির সকলেই চাইছিলেন যে, তিনি যেন বিপদে না পড়েন। তিনি বলতেন— "ওই ছেলেরা তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারে না।" নকশাল ছেলেরা সমাজের যে অংশের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে সশস্ত্র হয়েছিল তাদের কাজকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। কোনও দিন তাদের নিন্দে করেননি। অহিংসার পূজারি গান্ধীশিষ্য হয়েও তিনি চাইতেন নির্ভীক যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে; তাদের যুক্তি শুনতে, তাদের মনের কথা জানতে। ওই সব যুবক-যুবতীদের বীরের মর্যাদা দিতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।

এই সূত্রে মনে পড়ে গেল স্বাধীনতার ঠিক পরে পরে পান্নালাল দাশগুপ্তর নেতৃত্বে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই কথা। কয়েকটি বিদেশি কারখানাকে আক্রমণ করে, কিছু লোককে হত্যা করে তাঁরা বন্দি হয়েছিলেন। কারাগারে কাকাবাবু নিয়মিত যেতেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতেন। পরে তাঁদের মনের পরিবর্তন হয়।

একদিন বোসপাড়ার বাড়ি গিয়ে দেখি কাকাবাবুর জ্বর হয়েছে— শুয়ে আছেন। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। উনি ঠাট্টা করে বললেন, "শরীর খারাপ দেখে মুখ শুকিয়ে গেল কেন? দেখো না, কত তাড়াতাড়ি সেরে উঠি।" সত্যি, তাঁকে তো কোনওদিন এমন অসুস্থ দেখিনি, বড় দুশ্চিন্তা হল। বাড়ি ফিরে এলাম, কিন্তু মন পড়ে রইল তাঁরই কাছে। ফোন করে খবর নিই, শুনি একই রকম আছেন। কিছু ভালো লাগে না। কয়েক দিন পরে খবর পেলাম শরীর আরও খারাপ হওয়ার ফলে তাঁকে 'পার্ক ভিউ' নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছোট একটা অপারেশনের পরে বোসপাড়া লেনে তিনি আবার ফিরে গেলেন। কিছু দিন ভালো ছিলেন, পরে শুনলাম আবার খারাপ আছেন। দু'এক দিনের মধ্যেই ওঁর কাছে গেলাম। বসতেই বললেন, "মন শক্ত করো, আমার ক্যানসার ধরা পড়েছে। এ বার রোগের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।" আমার ফেরার পথে বুকের ভেতর যেন দামামা বাজছে। মনে হচ্ছে আমার কাকাবাবুর কেন এই রোগ হল, যা হয়তো সারবেই না। ওঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকি, অনেক কিছু যে ওঁর এখনও দেশকে দেওয়ার আছে। মন্দির নিয়ে কত কাজই না ভেবে রেখেছেন, অথচ সময় হয়ে উঠছে না। জানি না কেন এমন হয়? এমন কর্মচঞ্চল মানুষ অসময়ে কেন এভাবে চলে যাবেন? প্রায় দিনই বোসপাড়া লেনে ফোন করি। দিন সাতেক পরেই শুনি আবার নার্সিং হোমে এসেছেন। পার্ক ভিউ নার্সিং হোম আমাদের বাড়ির কাছে বলে প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে যাই। দেখি তিনি স্থির হয়ে বসে লেখা পড়া করে চলেছেন। আশৈশব আমি তাঁর ধৈর্য ও সহ্যের অসীম ক্ষমতা দেখেছি, তাই অবাক হই না। যে ওঁকে দেখতে আসছে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তিনি আলাদা করে তার ভালোমন্দের কথা শুনছেন। প্রতিকারের উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিচ্ছেন। কে রোগী তা বোঝার উপায় নেই। আবার একটা অপারেশনের পরে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। মোটামুটি ভালো ছিলেন ছ'মাস। তার পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় প্রতিদিন একবার ওঁকে না দেখলে কিছু ভালো লাগত না। যখনই যেতে পেরেছি দেখেছি উনি বই নিয়ে হয় পড়ছেন, না হয় লিখছেন। শান্ত এবং গভীর মনোযোগে। এই কালান্তক

রোগের মধ্যেও আমার দেওর সমীর সুরকে, বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধারে যে একটা ফার্ম করেছিল, তাকেও তিনি ওই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। আরও বললেন, "একবার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর কাছে যেয়ো বাঁকুড়ায়— তাঁর পরামর্শে তোমার উপকার হবে।" সমীর বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছিল এবং দাশগুপ্ত মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ তার কাজে লেগেছিল।

কাকাবাবুর অসুখের গতি ক্রমে দ্রুত হতে লাগল। এত দিন গেছি, শরীরের কোনও কষ্টের কথা কোনওদিন বলতেন না। মনে হতে লাগল তাঁর কষ্ট যেন বাড়ছে। কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতাম। নিজের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের সঙ্গে বলতেন, "তোমার মজা লাগছে তো? পায়ে হাত বুলোতে, এখন টাকে হাত দিচ্ছ। পেয়েছ সুযোগ, ছাড়বে কেন? যত দিন পারো করে নাও।" চোখে জল এসে যেত, পাছে বুঝতে পারেন মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। কাকাবাবুকে এই কঠিন অসুখের মধ্যে রেখেই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে উত্তরভারত বেড়াতে যেতে হল।

অনেক ঘোরার মধ্যেও কাকাবাবুর মুখখানি মনের মধ্যে প্রায় সব সময় ভাসত। ট্রেন কত মাঠ-ঘাট-নদী-প্রান্তর পার হয়ে ছুটেছে। আমাদের কামরার সবাই ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই, কেবলই সেই মুখখানি ভাসছে, তারই মাঝে মনে হল তিনি যেন আমার পাশটিতে বসে রয়েছেন। কৌতুকভরা হাসি নিয়ে বলেছেন, "কী বাদলরানী, আমায় ফেলে রেখে খুব বেড়ানো হচ্ছে! তুমি জানতেও পারছ না, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই রয়েছি।" মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হল।

ফিরে এসে প্রথমেই শুনলাম, তিনি আর নেই। চিরদিনের জন্য কোন অমৃতলোকে চলে গেছেন জানি না। আমার ভুবন যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আমার কোনও দিকে মন নেই। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছি আমি। আমি তাঁকে শেষ দেখাটুকু দেখতে পেলাম না, এ দুঃখ মনের মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছিল। শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় যাঁকে আমি একান্ত আপন করে পেয়েছিলাম, আমার সেই পিতৃপ্রতিম মানুষটি তাঁর তেজদৃপ্ত বলিষ্ঠ রূপে আমার মনের সোনার সিংহাসনে চিরদিনের জন্য বসে থাকুন। তাঁর স্নেহ ভালোবাসা আমার সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

সুধাদির কথা

সুধাদিকে (সুধাময়ীদেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী) প্রথম দেখেছিলাম তাঁর গুরপল্লির বাড়িতে। আমি তখন খুব ছোট, বোধ হয় ৬-৭ বছরের হবে। তাঁর ঘরে পা রাখতেই তিনি আমাকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে আদর ছিল, প্রশ্রয় ছিল, তাই আমার তাঁকে আপনজন মনে হয়েছিল। নতুন মানুষ দেখে ভয় করেনি, লজ্জা করেনি, কোনও কুণ্ঠা হয়নি। সে ঘরে যে সব খেলনা ছিল তাই নিয়ে খেলেছিলাম, গল্পের বই টেনে নিয়ে পড়তে, বসেছিলাম, যা খেতে দিয়েছিলেন তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেয়েছিলাম। অতি সাধারণ শাড়ি সাধারণ ভাবে পরা, মাথায় ঘোমটা, মায়েদের একজন বলেই তাঁকে মনে হয়েছিল। আমার বাবা হংসেশ্বর রায় শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যেতেন বই পড়তে বই আনতে। লাইব্রেরিয়ান প্রভাতদার সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, মাঝে মাঝে আমাকে বাবা সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাজ শেষ হলে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে গেলে প্রভাতদার সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটতে হাঁটতে যেতেন প্রভাতদার বাড়ি।

একদিন শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে বাবা বললেন, ‘‘আজ আমাদের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। প্রভাতদার বাড়িতে মেয়েরা নাটক করবে।’’ সন্ধের পর সুধাদির বাড়ির পিছনে ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ নাটক হল। গুরুপল্লির মেয়েরা অভিনয় করলেন,

আর সুধাদি সেই নাটকের পরিচালিকা। কী ভালোই যে লেগেছিল সে দিন! যিনি করালেন আর যাঁরা করলেন সকলের প্রতিই মন ধন্য ধন্য করে উঠেছিল। মেয়েদের এই ভূমিকা তো জানা ছিল না, ভাবনার অতীত ছিল। মনে হচ্ছিল এমনটি তা হলে হতে পারে! বারে বারে ঘুরে ফিরে একটা কথাই মনের মধ্যে আসছিল, আমাদের বোলপুরের মেয়েদের সুধাদির মতো ভালোবেসে যদি কেউ শেখাত, তবে আমরাও হয়তো মানুষকে এমনই আনন্দ দিতে পারতাম।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আরও কয়েক বছর পরে আমি শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলাম, পাঠভবনের শিশু বিভাগে ভর্তি হলাম, বীরভূমের প্রথম মেয়ের শ্রীভবনে বাস করার সৌভাগ্য হল। তখন বেশি দেখা হত সুধাদির সঙ্গে। বাড়ি যাওয়া আসার পথে বাবা নিয়ে যেতেন সুধাদির কাছে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, কোন বিষয় পড়তে ভালো লাগে, কী শক্ত লাগে এই সব। বাইরের বই পড়তে ভালোবাসি জেনে খুশি হয়েছিলেন। শ্রীভবনে থাকি, রান্নাঘরের খাবার খাই, কোনও অসুবিধা হয় কি না, সব কিছু ভালো লাগে কি না, প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইতেন। আমি আমার ছোট একটি মেয়ের মন নিয়েও এই জানার আগ্রহের মাঝে তাঁর স্নেহ ভালোবাসা-ভরা হৃদয়টি অনুভব করতাম।

১৯৩৪, '৩৫, '৩৬ শান্তিনিকেতনে পড়ার পরে আমার কিছু দিন বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার সঙ্গে আর কোনও যোগ রইল না। তত দিনে সুধাদি ভুবনডাঙার বাড়িতে চলে এসেছেন। বাবা কিছু দিন বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় প্রভাতদাকে ওই বিদ্যালয়ের জন্য অন্তত আই.এ. পাশ একজন শিক্ষয়িত্রী খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ জানান, যিনি মায়ের মতো ভালোবেসে মেয়েদের পড়াবেন। সুধাদি স্বয়ং যখন এ কাজে এগিয়ে এলেন বোলপুরের মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে, আশার অতীত পেয়ে বাবার আনন্দের সীমা রইল না।

১৯৩৫-এর শেষে সুধাদি যোগ দিয়েছিলেন বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁর আসার পরে উচ্চ প্রাথমিকে উন্নীত হয়। ১৯৩৭-এ একটি মেয়েকে নিয়ে মাইনর ক্লাস খোলা হল। আমি বাড়িতে নিজে নিজে আমার পুরোনো পাঠ্য বইগুলি নিয়ে পড়ি দেখে বাবা একদিন জিজ্ঞেস করলেন আমি সুধাদির কাছে পড়তে চাই কি না? আমি এত দিন ধরে তাঁকে জেনেছি, তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি, এখন তাঁর ছাত্রী হতে পাব, এ তো আমার সৌভাগ্য। সেই দিন রাতে বাবা এসে বললেন সুধাদি রাজি হয়েছেন আমাকে পড়াতে। পরের দিন থেকেই স্কুলে যেতে লাগলাম। সুধাদির সেই চিরপরিচিত হাসিমুখখানি দেখে মন ভরে গেল। বালিকা বিদ্যালয়ে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে অনেক ছাত্রী ছিল। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণিতে অল্প কয়েকটি মেয়ে, পঞ্চম শ্রেণিতে দুটি মেয়ে আর অষ্টম শ্রেণিতে আমি একা। ইন্দ্র পণ্ডিত মশাই, ধ্বজাধারী পণ্ডিত মশাই নীচের ক্লাসগুলোয় পড়াতেন। নগেন আইচ মশাই অঙ্ক করাতেন। অঙ্ক ছাড়া আমাদের সব বিষয় সুধাদি পড়াতেন।

সারা বিদ্যালয়ের সব কিছু তাঁর তত্ত্বাবধানে অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। এত দিনের পরিচয়েও তাঁর গলার গান আমি শুনিনি। গানের ক্লাসে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের গান মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। গান ভালোবাসলেও গান আমার হয়নি, কিন্তু বোলপুরের অনেক মেয়েই সুধাদিকে পেয়ে ভালো গান গাইতে শিখল।

তখনও থানার কাছে স্কুল। একদিন নগেন আইচ মশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর নাক দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল। সে যে কত রক্ত— যে দেখেনি সে ভাবতেও পারবে না। ভয়ে মুখ চুন হয়ে গেল মেয়েদের, অন্য দিনের কলরব নেই, হট্টগোল নেই, সব নিস্তব্ধ। আমাদের সুধাদি ধীর স্থির হয়ে তাঁর মাথায় জল ঢালতে লাগলেন অবিরাম ধারায়, একজনকে পাখার হাওয়া করতে বললেন। ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। এক ঘণ্টার চেষ্টায় নগেন আইচ মশাইকে সেবায় যত্নে কিছুটা সুস্থ করে গোরুর গাড়ি করে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সেই সেবিকা মূর্তিটি চিরদিন মনে রেখেছি। তাঁর ছাত্রীরা তাঁর কাছে সে দিন বিপদে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে যে কোনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে শিখল।

পারিবারিক নানা কারণে বেশ কিছু দিন ইস্কুল যেতে পারিনি। ইতিমধ্যে পুরোনো গুরু ট্রেনিং ইস্কুলের জায়গায় আমাদের ইস্কুল উঠে এসেছে। অষ্টম শ্রেণিতে এসেছে বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, বাইরের কোনও ভালো স্কুল থেকে। নবম শ্রেণির বই নিয়ে নতুন করে আমি এলাম। সুধাদি আমাদের দুজনকে অনেক বিষয় এক সঙ্গে পড়াতেন। সাহিত্যে আগ্রহ বাড়াবার জন্য নানা ধরনের লেখা তিনি আমাদের দিয়ে লেখাতেন। নিয়মিত কবিতা পড়তে বলতেন। 'চয়নিকা' খুলে বিশেষ কোনও কবিতা আবৃত্তি করতে বলতেন। বারবার পড়তে পড়তে আমরা কবিতা ভালোবাসতে শিখলাম। আমার গলায় 'প্রবাসী' কবিতাটি শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। আজও 'প্রবাসী' কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতার একটি। যতবার পড়ি তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। এই দুটি লাইন যেন তাঁকে নিয়েই লেখা—

যদি চিনি যদি জানিবারে পাই ধূলারেও মানি আপনা
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।

এখনকার এই খোলামেলা জায়গায় আম জাম শাল আর জানা অজানা নানা বনফুলের গাছের ছায়া ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যালয় যখন চলে এল, ছোট ছোট শিশুকন্যাদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠল চারিদিক। সুধাদিকে আমরা নতুন রূপে পেলাম। কত নতুন ধরনের সম্মিলিত খেলা আমাদের শেখালেন। কত গল্প, কত গান আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম। কত দিন আগে শান্তিনিকেতনে তাঁর করানো 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটক দেখে আমরা বোলপুরের মেয়েরা এমন পারি না বলে যে দুঃখ হয়েছিল, মেয়েদের দিয়ে সেই নাটক করিয়ে এত দিনে তা ঘুচিয়ে দিলেন সুধাদি। আমার বোন বর্ষার সুন্দর জোরালো গলা তাঁর ভালো লেগেছিল, তাঁকে বাল্মীকি-প্রতিভায় বাল্মীকির ভূমিকা দিলেন, একাধারে তিনিই সব— নির্দেশিকা,

পরিচালিকা সংগীত পরিচালিকা। সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবস্থা, অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো সবই তাঁর দায়িত্বে। সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানটি দেখে বোলপুরের মানুষরা ধন্য ধন্য করলেন, আর শান্তিনিকেতনের বোদ্ধা ও রসিকজনেরা মনের আনন্দে উপভোগ করলেন। একেবারে আনকোরা মেয়েদের দিয়েও যে রবীন্দ্রনাথের নাটক বা গীতিনাট্য এভাবে করানো যায় তা সুধাদি প্রমাণ করে দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই অনুষ্ঠান দেখে শৈলজাদা বর্ষাকে সংগীতভবনে নিতে চেয়েছিলেন, অল্প কিছু দিনের জন্য সে সংগীতভবনে গান শিখেওছিল; কিন্তু জীবনে গান নিয়ে থাকা তার হয়নি, বহু দিন আগে মনের দুঃখ নিয়ে সে চলে গেছে অন্যলোকে। অকালে তার এই চলে যাওয়াতে সুধাদি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন।

শুধু যে আমাদের বালিকা বিদ্যালয় তাঁর ছোঁয়া পেয়ে আলোকময় হয়ে উঠেছিল তাই নয়, ছোট মেয়েগুলির মায়েদের কথাও তিনি চিন্তা করতেন। তাঁদের সেই 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা'য় বাঁধা জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়া আনতে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। বহু দিন ধরে আমার মা পঙ্কজিনী রায় এককভাবে বোলপুরের মায়েদের অন্দরমহল থেকে বাইরে আনার যে আয়োজন করে চলেছিলেন, সুধাদি তাতে এক বৃহৎ মাত্রা যোগ করলেন। মহিলাসমিতির সভা এখন বিদ্যালয় গৃহেই হতে লাগল। শান্তিনিকেতন থেকে এই সভাতে বড়মা হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, লাবণ্যপ্রভা দেবী সভার অতিথি হয়ে আসতেন। সংখ্যায় অল্প হলেও বোলপুরের মেয়েরা আসতে লাগলেন তাঁদের কথা শুনতে, তাঁদের জানতে। গুরুদেবের কাছেও সুধাদি তাঁর বিদ্যালয় ও মহিলা সমিতির উন্নয়নের উপায় নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করতেন। এমনি করে বিশ্বভারতীর আদর্শ ও শান্তিনিকেতনের ভাবধারা বোলপুরের মেয়েদের জীবনে সুধাদিই এনে দিলেন।

কত দিন ধরে তাঁর সংসারে আমি যাওয়া-আসা করেছি, দেখেছি, যেমন বিদ্যালয়ে তেমনই গৃহে তিনি সর্বময়ী কর্ত্রী ও নিপুণ গৃহিণী ছিলেন। আমাদের তিনি স্নেহভরে যেমন করে সব দিক দিয়ে সুশিক্ষিত করে তুলতে চাইতেন, তাঁর ছেলেদের তিনি সেই ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। মনে পড়ে ছোট্ট বাবলু কেমন মেকানো নিয়ে মেতে থাকত, বাইরের জগতের ডাকে মাকে ছাড়তে কোনও দিন তাকে বায়না করতে বা কাঁদতে দেখিনি। প্রভাতদার সঙ্গে তাঁর সুন্দর সহযোগিতা ও আন্তরিক সহমর্মিতার সম্পর্ক ছিল। উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দুজনকে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে এত বিশাল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করার ক্ষমতা জুগিয়েছিল। তাঁর দুজনেই আমার শিক্ষক ছিলেন। আজ বহু দূরে অন্য কোনও লোকে তাঁদেরকে প্রণাম জানালাম। জানি না তা পৌঁছবে কি না। শতবর্ষে সুধাদির পুণ্যকথা বলতে গিয়ে আনন্দে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে ধন্য হলাম।

মোহরকে যেমন দেখেছি

আজকে বোলপুর শান্তিনিকেতনের দূরত্ব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, কিন্তু ৬০-৭০ বছর আগে এমনটি ছিল না। তখন বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুই অর্থেই সুদূরে ছিল। আমার বাবা হংসেশ্বর রায় নিয়মিত চর্চা করে নিজের জন্য এই দূরত্ব কমিয়ে এনেছিলেন। মাও সুরুলের মেয়ে ছিলেন বলে ছোটবেলা থেকেই শ্রীনিকেতনে তাঁর যাতায়াত ছিল। সবরমতীর গান্ধীর আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর শান্তিনিকেতনের আশ্রম-জননী বধূ ও কন্যাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাবা বিশ্বভারতী লাইব্রেরির মেম্বার ছিলেন, বাবার সাইকেলের রডে একটা ছোট সিট লাগানো ছিল, তাতে করে আমি প্রায় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলাম। গ্রন্থাগারিক ছিলেন প্রভাতদা, (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) আর প্রধান কর্মী ছিলেন সত্যদা (সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়) আমাকে বাবা সত্যদার কাছ থেকে একটি ছোটদের বই দিয়ে কোথাও একটা বসিয়ে রাখতেন। পরে কোনও কোনও দিন ফেরার পথে গুরুপল্লিতে প্রভাতদার বাড়িতে নিয়ে যেতেন। প্রভাতদার বাড়ির পাশেই সত্যদার বাড়ি। সেখানেও সেই অতি শৈশবেই যাতায়াতের কল্যাণে মোহরকেও চিনেছিলাম। ওকে যেমন সুন্দর দেখতে আর তেমনই তার মিষ্টি স্বভাব। সহজেই

আপন করে নিতে পারত। তখন ওকে আমি মোহরদি বলতাম। আমার চেয়ে ও একটু বড় ছিল। মোহরদির মাকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম ছিল অনিলা দেবী। কত অল্প আয়ের সংসারে গৃহস্থালি করেও কী আনন্দে যে ভরিয়ে রাখতেন নিজেকে, উদয়াস্ত পরিশ্রম তাঁর গায়েই লাগত না। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই সংস্কৃত কথাটি না জেনেও নিজের বহু সন্তানের সঙ্গে যে-কোনও শিশুকেই আপন সন্তান জ্ঞানে মাতৃস্নেহের ভাণ্ডার উজার করে দিতে পারতেন। বয়স অনেক বেড়ে যাওয়ার পরেও তাঁর কাছে গিয়ে সেই চিরকালীন আদর পাওয়ার কোনও কমতি ঘটেনি। পরে গোঁসাইজির স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর কন্যা আলো ও ছায়াকে মাসিমা আপন সন্তানের মতোই লালনপালন করেছিলেন। লাইব্রেরি যাতায়াতের ফলে আর বই নেওয়ার জন্য মোহরদির বাবা সৌম্যদর্শন সত্যদাকেও আপন করে জেনেছিলাম। লাইব্রেরির বই পাওয়ার তখন আমার কোনও অধিকারই ছিল না। তবু এই বাইরের মেয়েটাকে আইন ভেঙে তিনি বই দিতেন, হয়তো এ বয়সেই বই পড়ার অপার পিপাসা তাঁর অনুভবে ধরা পড়েছিল।

সুধাদি-প্রভাতদার বাড়ির দক্ষিণ দিকে সুন্দর মাসিমার বাড়ি ছিল। ও বাড়ির দুই মেয়ে হাসুদি আর অনুকেও তখন চিনেছিলাম। হাসুদির বন্ধু মমতাদিকেও তখন দেখেছিলাম। সুধাদি এস্রাজ নিয়ে বসতেন আর মোহরদি হাসুদি মমতাদি অনু নাচেগানে আনন্দে মুখর করে তুলত সেই বৈকালিক আসর। পরে একদিন শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে বাবা বললেন, "আজ আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। প্রভাতদার বাড়িতে মেয়েরা নাটক করবে।" সন্ধের পর সুধাদির বাড়ির পিছনে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটক হল। গুরুপল্লির ওই সব মেয়েরা অভিনয় করলেন। সেই নাটকেও মোহরদির উপস্থিতি ছিল, তবে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছিল তা মনে নেই।

পরে শান্তিনিকেতনে পড়ার সৌভাগ্য হল, বীরভূমের প্রথম মেয়ে হয়ে গুরুদেবের আশ্রমের আঙিনায় ঠাঁই পেলাম। তখন একদিন মোহরদির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়লাম, ওকে মোহর বলে ডাকতে লাগলাম। ওর ভালো নাম ছিল অণিমা মুখোপাধ্যায়। একদিন আমাদের ক্লাসে গুরুদেবের একটি চিঠি এল। আমরা জানলাম গুরুদেব ওর নাম বদলে দিয়েছেন, অণিমার বদলে ওর নাম হয়েছে কণিকা। ক্লাস শেষ হওয়ার পর সবাই প্রশ্ন করতে লাগলাম, কেমন করে গুরুদেব ওর নাম জানলেন। ও বলল, ঝড়ে আম কুড়াতে গিয়ে বৃষ্টি এসে পড়ায় ওরা (সঙ্গে আর কেউ ছিল বোধহয়, আজ নাম মনে পড়ছে না) গুরুদেবের ঘরে সম্ভবত কোনার্কে গিয়ে পড়েছিল। তিনি ওদের গান গাইতে বলেছিলেন এবং মোহরের মিষ্টি গলার গান শুনে খুশি হয়ে ওর নতুন নামকরণ করেছিলেন। আমাদের সব ক'টা ক্লাসেই গুরুদেবের ওই চিরকুট

গিয়েছিল, যার ফলে সব ক্লাসেই ওর নাম ডাকা হতে লাগল 'কণিকা' বলে আর আজকে ও কণিকা নামেই বিখ্যাত। ক্লাসের বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সবাইকারই শিকড় ছিল পূর্ববঙ্গে, মোহর আর আমিই ছিলাম এ দিককার মেয়ে। একজন বীরভূমের আর একজন মানভূমের। ওইখানে একটা মিল ছিল আমাদের, তাই এক জায়গায় একাত্মতা অনুভব করতাম। গানের ক্লাসে গানও শিখেছি নুটুদির কাছে, শান্তিদা ও শৈলজাদার কাছে ওরই সঙ্গে, কিন্তু সে ছিল নামেই শেখা, যার গানের অধিকার ছিল সে চলে গেল অনেক উঁচুতে।

পরে একবার সাহিত্যসভায় ও হীরাবাই বরোদকারের মতো সংগীতশিল্পী হওয়ার আকাঙক্ষার কথা জানিয়েছিল। মানুষকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেওয়ার স্বপ্নই সেই লেখাটির মূল বিষয় ছিল। আজকে সবাই জানেন যে সে-স্বপ্ন ওর পরিপূর্ণভাবেই সফল হয়েছে। যখন ও সংগীতভবনে গানের শিক্ষার্থী হল, ওর কাছে শুনেছিলাম মার্গসংগীতের শিক্ষক পণ্ডিত ওয়াঝেলওয়াড় ওর ওই লেখাটির কথা কোন সূত্রে জেনেছিলেন, যে দিন ওর সুরে কোনও ভুল হত অথবা ঠিক সুরটি গলায় লাগত না সে দিন উনি বিদ্রুপ করে বলতেন, "ইনি আবার হীরাবাই বরোদ্‌কার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কত সাধ যায়রে চিতে!" কিন্তু গলা যে দিন ঠিক থাকত, গান সত্যিই ভালো হত, সে দিন খুশি হয়ে বলতেন, "হ্যাঁ এমন গাইতে পারলে একদিন হয়তো তুমি হীরাবাই বরোদকারের মতো শিল্পী হলেও হতে পারো।" গুরুর আশীর্বাদে কারও মতো নয়, নিজের মতোই সর্বকালের সেরা অসাধারণ এক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও হতে পেরেছিল। ওর গানের ভুবন ওকে আজ কত মানুষের প্রাণের গহনে স্থান করে দিয়েছে, সেখানেই ও আজ চিরজয়ী।

প্রথম খুব বড় যে-সভায় ওর গলায় গান শুনি, মনে হয় সেটি ছিল বসন্তোৎসবের সভা, 'ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে' ও তখন নিজে পঞ্চদশী হয়েছিল কি না তা মনে পড়ছে না— তবে সেই গান কত যে ভালো লেগেছিল তা মনে করতে গেলে আজও মনের মধ্যে অনুরণন জাগে। আমার বোন বর্ষার সুন্দর জোরালো গলা ছিল। বোলপুরে তখন গান শেখার বিশেষ কোনও সুযোগ ছিল না। আমরা দুই বোনে তখনকার বোলপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টারমশাই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী আমাদের মাসিমার কাছে গান শিখতাম। মাসিমা বর্ষার গানের গলার এবং ওর সংগীতপ্রতিভার উচ্চপ্রশংসা করতেন। আমাদের সুধাদি (সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়) বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান হয়ে এলেন, তখন উনি গানের ক্লাসে গান শেখাতে গিয়ে বর্ষার দরাজ গলার গান শুনে খুশি হন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যতে বর্ষাকে উনি বাল্মীকির ভূমিকার জন্য মনোনীত করেন। সে দিন মোহরও এসেছিল ওই

অনুষ্ঠান দেখতে। ওরও ভালো লাগে ওর গান, আর তাই নিজে থেকেই একদিন বর্ষাকে গান শেখাতে চাইল। এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে কত বড় মন ছিল ওর। শান্তিনিকেতনে ছুটির সময় মোষের গাড়িতে করে যেতাম। এখন যেখানে পূর্বপল্লির গেস্টহাউস তখন সে এক অতি নিরিবিলি জায়গা, সেই গাড়ির ভেতরে বসেই ও গান শেখাত, মনে হয় চিত্রাঙ্গদার 'রোদন ভরা এ বসন্ত' আর 'জানালার ধারে ব'সে আছে করতলে রাখি মাথা' 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে' 'স্বপন-পারের ডাক শুনেছি' এই রকম কয়েকটি গান বর্ষা ভালোভাবে শিখেছিল ওর কাছ থেকে। আজকের দিনে এ কথা কি কল্পনাতেও আনা যায়! গুরুদেবের স্নেহধন্যা তখনকার বেতারে গান গাওয়া ও কয়েকটি রেকর্ড বের হয়ে যাওয়ার পরেও এমন সহজে কাউকে গান শেখাবার তাগিদ ও কোথা থেকে পেয়েছিল? শুধু যে গান শেখাত তা-ই নয় কত গল্প করত আমাদের সঙ্গে, ওর কলকাতা যাওয়ার রেকর্ড করার; ১ নম্বর গার্স্টিন্ প্লেসের রেডিও স্টেশনের অনেক কিছু ওর মুখে শুনে শুনেই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। একটা মজার গল্প বলেছিল, ও যখন ট্রামে করে কোথাও যাচ্ছিল, এক ভদ্রমহিলা ওর সহযাত্রিণী, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে পরিচয় বের হয় সম্পর্কে উনি ওর কাকিমা হন। (কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন হতেই পারে, তারাশঙ্করের লেখায় আমরা এমন ঘটনা পেয়েছি) পরে তাঁর সঙ্গে ওর অনেক দিন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কতটুকু সময়ের মধ্যেও যে-কোনও মানুষকে কত আপন করে নিতে পারত ও, এর ভেতর দিয়ে তাই আমরা জানলাম। পরে বর্ষা কিছু দিন সংগীতভবনে গান শিখেছিল, ওর সঙ্গে গান শিখত নীলিমা সেন (বাচ্চু)। মোহরের সঙ্গে বর্ষার সম্পর্ক তখন অনেক গভীর হয়েছিল, কিন্তু গানের ভুবনে থাকা বর্ষার আর হয়ে ওঠেনি। অল্প বয়সে মনের দুঃখ নিয়ে তাকে চলে যেতে হয় অন্যলোকে, আমাদের সঙ্গে আপন জনের মতই তার বিচ্ছেদবেদনা মোহরকেও স্পর্শ করেছিল।

শিশু বিভাগে যখন ছিলাম তখন উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় যে সব গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল হত, সব সময়েই আমরা তার দর্শক থাকতাম, মাঝখানে চেয়ারে বসে থাকতেন গুরুদেব স্বয়ং। চিরদিন যেখানে যখন তাঁকে দেখেছি, আকাশের রবির মতোই তাঁর উপস্থিতিতে আলোকময় হয়ে থাকত সেই স্থান। সেই ঝলমলে রূপ যে দেখেছে তারই হৃদয়ে আঁকা হয়ে আছে সেই ছবি। এখন ভাবি আমরা ছোটরা কেন সেই সব অনুষ্ঠানের নিয়মিত দর্শক থাকতাম। মনে হয় গুরুদেব চাইতেন ছোট থেকেই আমাদের বোধ ও মননকে বাড়িয়ে তুলতে। রুচির মাত্রায় গভীরতা আনতে। 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা' 'নটীর পূজা' 'তাসের দেশ', এমনকী

শারদোৎসব বসন্তোৎসব বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানের আগে যে সব রিহার্সাল হত, সবই আমরা দেখতাম শুনতাম। আর মোহর সেই ছোট্টটি থেকেই গানের দলের আসরে ভাগ নিত। আমাদের গর্ব হতো আমাদেরই একজন এমন ভালো গান গায় যে সে আমাদের সঙ্গে নয়, শিল্পীদের সঙ্গেই গুরুদেবের আসনের পাশটিতে বসে আছে।

পরে যখন বড় হয়েছি, ধীরেনদার বাড়ির এদিকে অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা এল ঢাকা থেকে। ওর মা ও ছোট ভাইরা সঙ্গে ছিল। ওরা ভাই বোনেরা সবাই ভর্তি হল পাঠভবনে। অরুন্ধতী দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনই গানও গাইত খুব ভালো। মোহরের সঙ্গে অরুন্ধতীর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল, ওদের দুজনেরই ম্যাট্রিক পরীক্ষার একটি বিষয় ছিল গান। তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে কলকাতা যেতে হত। ওদের দুজনের গান ছিল বলে ওরা দুজনে এক জায়গা থেকেই গানের লিখিত ও প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা দেয়। পরবর্তী জীবনে মোহরের মতো অরুন্ধতী রবীন্দ্রসংগীতে প্রাণমন ঢেলে দেয়নি, পরে ও অভিনেত্রী হিসেবেই নাম করেছিল।

শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে যখন দূরে চলে আসতে হল, মোহরের সঙ্গে আগের মতো যোগাযোগ রইল না। তবে ওর গানের থেকে দূরে যাইনি। রেডিওতে ওর গানের অনুষ্ঠান শুনতে কখনও ভুল হয়নি আর রেকর্ডও প্রাণভরে শুনতাম। 'চিরসখা হে ছেড়ো না' 'বাজে করুণ সুরে' 'দূরে কোথা দূরে দূরে' 'তবু মনে রেখো' 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' আরও কত কত গানে ওর মধুর কণ্ঠস্বরের জাদু, গায়কির অনন্য রস। আপনভোলা ভঙ্গিমা, প্রাণ মাতানো সংবেদনশীলতা যে কোনও শ্রোতাকে আবিষ্ট করে রাখে, আপ্লুত করে দেয়। লিখে আমি কাউকেই সে অমৃতধারার আনন্দের এতটুকু আস্বাদ এনে দিতে পারব না। খবর পেয়েছিলাম ও সংগীতভবনের অধ্যাপিকা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ওর বিয়ে হল বীরেনদার সঙ্গে। বীরেনদাও সত্যদার মতোই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫০ সালে আমার কন্যা সুতপা শান্তিনিকেতন পাঠভবনে শিশু বিভাগে ভর্তি হল, তার আগেই মোহরের সঙ্গে, ওর বাড়ির সবার সঙ্গে আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তিনি সত্যদাকে সুতপার স্থানীয় অভিভাবক নিযুক্ত করেন। মোহরের এক বোন রুনু সুতপার সঙ্গে পড়ত। সত্যদা প্রতি বুধবার সুতপাকে শ্রীভবন থেকে তাঁর বাড়িতে এনে আবার সন্ধেবেলা ওখানে রেখে আসতেন। আগেই বলেছি, মাসিমা যে কোনও শিশুকেই আপন সন্তানের মতোই আদরযত্ন করতেন। আমি তাঁর কন্যাসম আর আমার সন্তানকেও তিনি বাড়ির বাইরে থাকার কষ্টটুকু সপ্তাহে এক দিনের জন্যও হলেও ভুলিয়ে রাখতেন। এমন স্বার্থলেশশূন্য বাবা-মা'র প্রথম সন্তান হয়ে জন্মেছিল মোহর, তাই তাঁদের চারিত্রিক ঔদার্য এবং যে-কোনও মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিল।

মোহর যখন সংগীতভবনের অধ্যাপিকা তখন ছোটবোন ঝর্নার গান শুনে শৈলজাদা ওকে সংগীতভবনে ভর্তি করার কথা বাবাকে বলেন। ও সংগীতভবনে ভর্তি হয়। প্রথম দিন থেকেই মোহরের ভালোবাসায় ওর মন ভরে যায়। নিয়মিতভাবে ৩ বছর ওখানে শেখার সুযোগ ও পেয়েছিল। এবং পরীক্ষার ফলও খুব ভালো করেছিল। সাইকেলে করে ও শান্তিনিকেতনে যেত। একদিন যাবার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পরে বেশ কিছু দিন লাগে তার সেরে উঠতে। প্রায় ৩ মাস পরে যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তখন সমস্যা হল কী করে সংগীতভবনে তার সতীর্থদের সঙ্গে ক্লাস করবে? তারা এই ক'মাসে অনেকটাই তো এগিয়ে গেছে। ও মন খারাপ করে থাকে দেখে আমার মা একদিন সত্যদার বাড়িতে যান। তখন মোহর মাসিমার কাছে এসেছিল। এমনিতে ঝর্নার জন্য সেও চিন্তা করছিল। সব কথা জেনে মাকে আশ্বাস দেয় যে ঝর্নার গান শেখানোর ভার সে-ই নেবে।

তার পর থেকে ওর বাড়িতে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ ধারায় ওকে শিক্ষিত করে তোলে। কত দিন ধরে ঝর্না বীরেনদা-মোহরের বাড়িতে নিত্য উপস্থিতিতে ওই বাড়িরই একজন হয়ে ওঠে। মোহরের উৎসাহে এবং আমার ভাই অরিজিতের চেষ্টায় ও আগ্রহে ও মহাজাতিসদনে (সম্ভবত বঙ্গসম্মেলনে) একক গান করে। তার পর বেতারেও অডিশন দিয়ে নিয়মিত কয়েকবার গান করবার সৌভাগ্য অর্জন করে। সব ক'টি গানই মোহর অতি যত্নে ওকে আলাদাভাবে তৈরি · রে দিয়েছিল। এ সব লিখতে গিয়ে মনের মধ্যে দুঃখের ঢেউ ওঠে। বর্ষাকে অত যত্ন করে গান শিখিয়েছিল— তার গান নিয়ে থাকা হয়নি। তার পর তার জীবনও অকালে ঝরেই গেল। ঝর্নাও মোহরের কত যত্নে দরদ দিয়ে শেখানোর মর্যাদা রাখতে পারেনি, অন্য বাড়িতে গিয়ে সাংসারিক কারণে ওর গানের জীবনটাই ঢাকা পড়ে গেল। মোহরের মহত্ত্ব তাতে কমে না, আমরা ওর কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। যার গাইয়ে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে, তাকে গড়ে তোলার জন্য অত বড় শিল্পী কীভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে, তাই জানাবার জন্যই এ সব কথা লিখলাম।

ঝর্নার বিয়ে বোলপুর থেকে হয়নি। বরপক্ষের সুবিধার্থে কলকাতা থেকেই হয়। তাই মোহর ওর বিয়েতে আসতে পারেনি। ঝর্নার বিয়ের পর নবদম্পতিকে নিয়ে ওর নিচুবাংলার কোয়ার্টার্সে যাই। বীরেনদা-মোহর দুজনেই খুব উষ্ণ অভ্যর্থনা করেছিল। আমার সঙ্গেও অনেক দিন পরে দেখা হওয়ার জন্য সে দিন অনেক পুরোনো দিনের কথায় সুন্দর সময় কেটেছিল। সেই সময় ওদের বন্ধু কোনও অধ্যাপক সে বাড়িতে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ও হঠাৎ আমাকে উল্লেখ করে বলে বসল, "কল্যাণী খুব ভালো আবৃত্তি করত। গুরুদেব ওকে 'আষাঢ়' কবিতা

আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন কোনও এক সভার জন্য।'' আমি তো লজ্জায় মরি! সে কোন যুগের কথা, এখন কোনও চর্চা নেই বলে এড়িয়ে যেতে চাই। ও কিছুতেই শুনল না। চয়নিকা খুলে 'আষাঢ়' কবিতা খুঁজে আমাকে আবৃত্তি করিয়েই ছাড়ল। অধ্যাপক মশাই গুরুদেবের শেখানো কবিতা শুনে খুশি হয়ে মোহরকেই ধন্যবাদ দিলেন, এ যুগে এমন আবৃত্তি অনেক দিন পরে শোনার আনন্দ দেওয়ার জন্য।

মোহরের নিজের বাড়ির নাম রেখেছিল আনন্দধারা, ও নিজেও তো তাই ছিল। অগণিত মানুষের মনে আনন্দের ধারা বইয়ে দিতে পেরেছিল। এখানেই তো ওর সার্থকতা। একবার ওর আনন্দধারায় গিয়েছিলাম সুতপার সঙ্গে, খুব ভালো লেগেছিল ওর অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও ভালোবাসার প্রকাশ দেখে। 'পাঠভবনের চিঠি'তে আমার একটি ছোট লেখা দেখে ও খুব খুশি হয়েছিল, আরও লিখতে বলেছিল। আমি ওর সেই সাহিত্যসভার লেখার উল্লেখ করাতে ও বলেছিল, ইচ্ছে আছে ওর শিল্পীজীবনের কথা লেখবার। জানি না ওর ব্যস্ত জীবনে ও কতখানি লিখে উঠতে পেরেছিল।

বিনয়ভবনে যে সাধুবাবা থাকতেন, তাঁর কথা অনেকের মুখে শুনেছিলাম। প্রথম দেখে তাঁকে খুব আপন মনে হয়েছিল। তিনি কোনও ধর্মকথা শোনাতেন না। বহু মানুষের সুখ দুঃখ-বেদনার কথা মন দিয়ে শুনতেন, অতিথিজনদেরও সেই সব কথা বলতেন আর সকলের মঙ্গল কামনা করে আশী৲৷দ করতেন। আমি বোলপুরে গেলে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম। আমার বাবার শেষশয্যায় তাঁকে সেবা করার ভার আমি পেয়েছিলাম। সেই সময় সাধুবাবা বাবাকে দেখতে আসেন। তখনই শুনেছিলাম মোহরকে উনি খুব স্নেহ করেন। বাবার চলে যাওয়ার বেশ কিছু কাল পরে মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে চিকিৎসার জন্য মাকে কলকাতা নিয়ে আসব। মা সাধুবাবাকে প্রণাম করতে যেতে চাইল। আমাদের রিকশা সাধুবাবার আশ্রমের প্রাঙ্গণে দাঁড়াতেই মনে হল মোহর বাবার ঘর থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে চলে গেল। শেষ মুহূর্তে ও একবার ফিরে তাকিয়ে মাকে দেখে ফিরে এল। মাকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার হাতদুটি চেপে ধরল। এমনই ছিল ওর মন। শিল্পী-জীবনের শিখরে উঠেও একদিন যারা কাছের মানুষ ছিল তাদের কখনওই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাতে ওর কুণ্ঠা ছিল না। শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী হিসেবেই নয়, একজন অতি কাছের মানুষ বলেও তাকে চিরদিন মনে রাখব।